দাওয়াহ সংস্করণ

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.

সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া
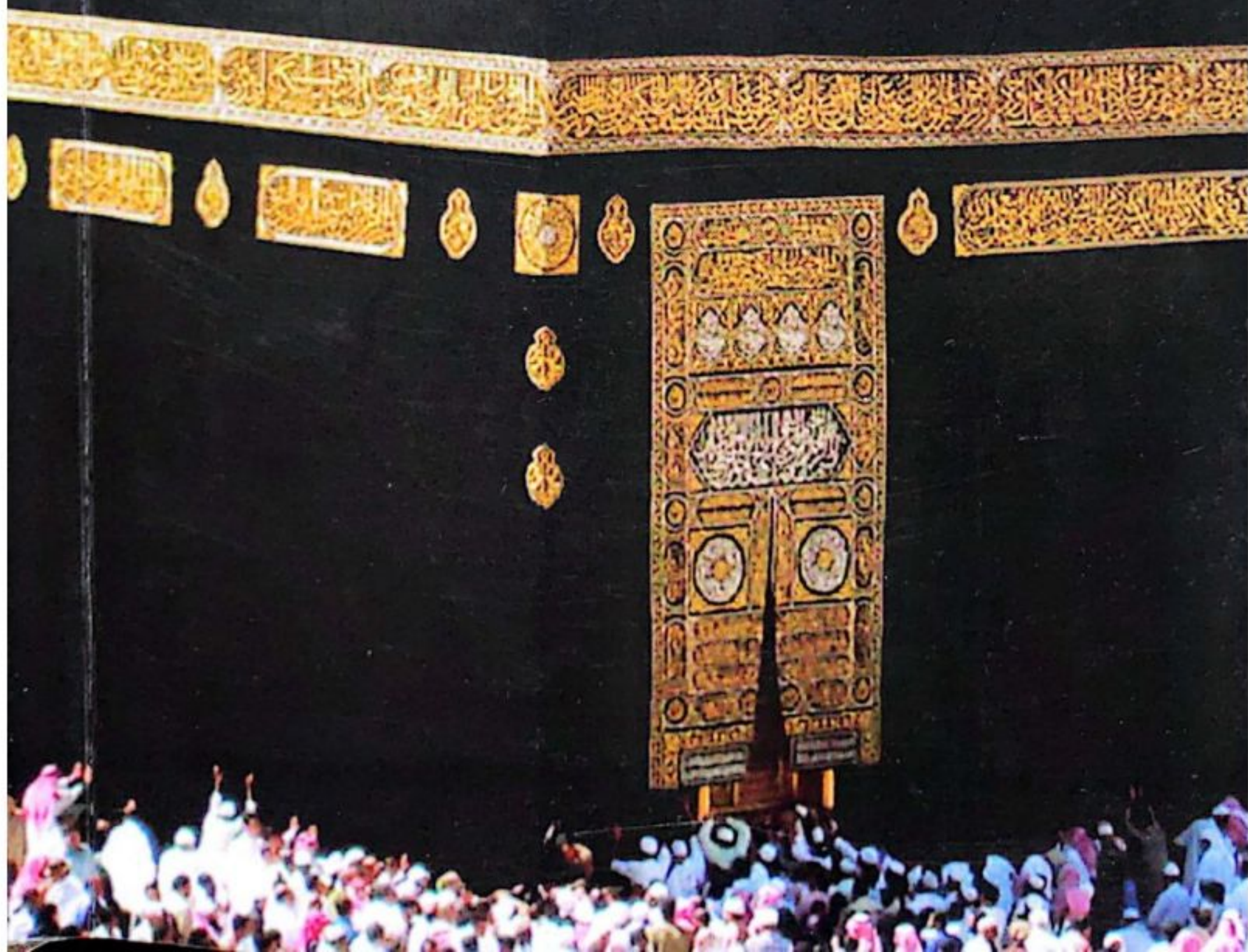
আমাদের প্রকাশিত আরও কিছু সিরাতগ্রন্থ

সিরাতুন নবি ﷺ, (তিন খণ্ড), ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
আরবি নবি, মাওলানা কাজি জায়নুল আবিদিন মিরাঠি রাহ.
শ্রেষ্ঠমানব, শায়খ মুহাম্মাদ হারুন আজহারি রাহ.
রহমতে আলম, ড. আয়িজ আল কারনি (প্রকাশিতব্য)

সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ

মূল : মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.

অনুবাদ : ইলিয়াস মশহুদ

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০২২
(দাওয়াহ সংস্করণ, ১৫ হাজার কপি)
প্রকাশকাল : মে ২০২২

মূল্য (নির্ধারিত) : ৳ ৬০

প্রচ্ছদ : আলাউদ্দিন

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা
বন্দরবাজার, সিলেট।
০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-5-1

Sirate Khatamul Ambia S.M.
by **Mufti Muhammad Shafi Rah.**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

প্রকাশকের কথা

সিরাত কথিকা : আমাদের প্রকাশিত *সিরাতুন নবি, আরবি নবি* ও *শ্রেষ্ঠমানব* তিনটি সিরাতগ্রন্থ থাকার পরও *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া* প্রকাশে কেন উদ্যোগী হলাম—কালান্তরের যেকোনো পাঠকের মনে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে পারে।

পৃথিবীতে একমাত্র মানব নবিজি, যাঁর জীবন চর্চা ও গ্রন্থায়নে অতুলনীয়—এ তাঁর এক বিশেষত্ব। ফলে একই লেখক যদি একাধিক সিরাত লিখেন, তাতে অবাক-বিস্মিত-ভাবাতুর হওয়ার কিছু নেই আর। কারণ, এমন অনেক মনীষী গত হয়েছেন, যাঁরা একাই একাধিক ভাষা-ভঙ্গি-পদ্ধতিতে নবিজির জীবনকে চিত্রায়ণ করেছেন। এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে বর্তমানেও নানাজন ও প্রতিষ্ঠান নানা দিক থেকে তাঁর একাধিক সিরাত লিখে চলছেন। আমরাও একটু তাঁদের অনুরূপই বলা যায়। তবে আমাদের পূর্বপ্রকাশিত তিন সিরাত আর বর্তমানটির সবকটিই নিজস্বতায় মণ্ডিত।

সিরাতুন নবি—তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি বড়দের জন্য। এর বিশেষ একটি দিক হলো, নবিজির জীবন-অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে বর্তমানের রাজনৈতিক অস্থিরতার সমাধান পেশ করা হয়েছে তাতে। ফলে গ্রন্থটি নানান ভাষায় অনূদিত হয়ে অগণিত মানুষের পাঠের টেবিলে শোভা পাচ্ছে মনভাঙা অবসর আর কঠিন তুমুল ব্যস্ততায়।

আরবি নবি ও *শ্রেষ্ঠমানব*—গ্রন্থ দুটির কলেবর প্রায় সমান। তবে স্বাদ, গুণ ও মানে কোনটি ফেলে কোনটির কথা বলি! এক বৈঠকে নবিজির বিস্তৃত জীবনের সংক্ষিপ্ত পাঠ জরুরি হলে যে-কেউ এ দুটির যেকোনোটি পড়তে পারেন। একদম কিশোর থেকে বুড়ো, সবার জন্য উপযোগী করে সাজানো-গোছানো গ্রন্থ দুটির ভেতর-বাহির।

সিরাতের খাতামুল আম্বিয়া—এটিরও নির্দিষ্ট কোনো পাঠকশ্রেণি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা একে সর্বশ্রেণির জন্য সুপাঠ্য করতে যথাসাধ্য সতর্ক থেকেছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। বিশেষত এটি যেহেতু বিভিন্ন মাদরাসাবোর্ডের সিলেবাসভুক্ত, ফলে কিশোর ও সর্বসাধারণের কথা মাথায় রেখে এর ভাষায় পাণ্ডিত্যসুলভ উচ্চারণ পরিহার করেছি। বিপরীতে সহজ-সাধারণ শব্দ-বাক্য ব্যবহারে থেকেছি আন্তরিক।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ব্যাপারে মূল্যায়ন-মন্তব্য অথবা আশাবাদ : মুফতি শফি রাহ.—সমগ্র বিশ্বের ইলমি ময়দানে যাঁর পরিচয় তিনি। এবং বিশেষত উপমহাদেশ যাঁর ইলম ও

চিন্তার কারনামায় চিরঋণী; এই মনীষীর রচিত গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন স্নেহের ইলিয়াস মশহুদ; আর সম্পাদনায় কাজ করেছি আমি ও মুতিউল মুরসালিন। ইলিয়াস লেখালেখি করছে সেই কৈশোর থেকে। বিভিন্ন দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা-ম্যাগাজিন আর স্মারক ও বইয়ে তাঁর নানারকম লেখাজোখা থাকলেও এটিই তার একক ও প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। তবে সে কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদে দীর্ঘদিন থেকে সম্পৃক্ত। ইলিয়াসের জন্য শুভ কামনা। আশা রাখি উম্মাহ সামনে তার থেকে আরও আরও কাজ পাবে ইনশাআল্লাহ।

মূল গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর শিরোনাম থাকলেও অধ্যায়, উপশিরোনাম ইত্যাদি না থাকায় এর পাঠ ও ইয়াদ একটু কষ্টসাধ্যই থেকে গিয়েছিল। আমরা এই জায়গার শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেছি। যুক্ত করেছি প্রয়োজনীয় টীকাটিপ্পনী। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও ঘটনাগুলো পরিক্ষার্থী ও পাঠকের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে সেটিংয়েও থেকেছি সাদামাটা অথচ অনস্বীকার্য শৈল্পিক। ফলে চোখধাঁধানো কেনো আকার-প্রকৃতি বা ইফেক্ট ব্যবহারে যাইনি কোথাও।

গ্রন্থটির গুরুত্ব বুঝতে বা বোঝাতে এ তথ্যটি জানা থাকাই যথেষ্ট যে, এটি দীর্ঘদিন থেকে উপমহাদেশের দীনি প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সিলেবাসভুক্ত হয়ে আছে। আর তাই অপরাপর ভাষার মতো বাংলায়ও রয়েছে এর অনেক অনুবাদ। তবে আমরা আমাদের কাজের কষ্ট, শ্রম ও পরিশ্রমনিষ্ঠা বোঝাতে গিয়ে পাঠককে আশ্বাস দিতে পারি—গ্রন্থটির এ যাবত যত অনুবাদ বাজারে আছে, সবকটির তুলনায় আমরা মূল গ্রন্থ ও এর অনুবাদ যে ভাষা ও মানের আবেদন রাখে, তার পুরোপুরি বর্ণায়ন না পারলেও কাছাকাছি যেতে পেরেছি। ফলে সার্বিক বিবেচনায় আমরা মনে করি, এই অনুবাদকে নিশ্চিন্তেই মূল গ্রন্থের বাংলা সহোদর বলা যায়।

এই এতকিছুর পরও বলতে হয়, কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি পেলে আমাদের অবগত করবেন, পাঠক-শুভার্থী ও সমালোচকৃন্দ।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
৩০ এপ্রিল ২০২২

অনুবাদকের কথা

সিরাত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মুসলমানমাত্রই বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত শেষ নবি সাইয়িদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত পাঠ করা জরুরি। ফলে মুসলিমসমাজে সাহিত্যরচনা ও গ্রন্থ সংকলনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে অসংখ্য লেখক বিভিন্ন ভাষায় অগণিত সিরাতগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করে যাবেন। এ পরম্পরা চলতেই থাকবে।

বছরখানেক আগের কথা। লাইব্রেরিতে বই কিনতে গিয়েছি। থরে থরে সাজানো বইগুলো দেখছি আর ভাবছি, চাইলে আমিও তো এভাবে কয়েকটি বই লিখতে পারতাম; কিন্তু লেখালিখির পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার দেড় যুগ পার হলেও এখনো তেমন কিছু করতে পারিনি। সেই ভাবনা থেকেই ভাবলাম—এবার অন্তত কিছু একটা করি। না, এক বছর পার হলেও সে সুযোগ হয়নি। নানাবিধ ব্যস্ততায় 'ভাবনা'র কথা ভুলে যাই।

কয়েক মাস আগে বরকতময় রবিউল আউয়ালের আগমনী বার্তা এবং একমুঠো অবসরে সেই 'ভাবনা'টা আবার জেগে ওঠে। কাজ যখন শুরু করবই, তখন পুণ্যময় একটি বিষয় দিয়েই শুরু করি! সেদিন লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.-এর *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া* ﷺ নামে অত্যন্ত মুফিদ বইটির অনুবাদ শুরু করি। বিষয়বস্তু কঠিন হলেও বইটি পরিচিত এবং ছাত্রজামানায় বার বার পড়েছি বলে এই প্রথম অনুবাদে সাহস করা। আলহামদুলিল্লাহ, অসুস্থ শরীর এবং কাঁচা হাতের ভাঙা কলমে দীর্ঘ রাতজাগা পরিশ্রমের ফসল এখন আপনাদের হাতে।

বলে রাখা ভালো, গ্রন্থটির কয়েকটি অনুবাদ বাজারে আছে। এরপরও কেন নতুন করে অনুবাদ করতে গেলাম, পাঠক বইটি পড়লেই এর উত্তর পেয়ে যাবেন আশা করি। তা ছাড়া এটি কওমি মাদরাসার পাঠ্যতালিকায়ও রয়েছে, সে হিসেবে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদ সত্যিই কঠিন এক বিষয়, তবু চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ সুন্দর করতে। এ জন্য অনেক জায়গায় ঈষৎ সংযোজনও করেছি। গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কিছু টীকাও যুক্ত করেছি। মূল বইয়ে নেই, এমন দু-তিনটি শিরোনাম এবং অতিরিক্ত কিছু আলোচনাও

স্থান দিয়েছি। এ ছাড়া মূল বইয়ের আলোচনা অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত ছিল না, পাঠকের সুবিধার্থে আমরা বইটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। আর শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে বইয়ের শেষে অনুশীলনীমূলক প্রশ্নোত্তরও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বইটি অত্যন্ত উপকারী। লেখক সাধারণ পাঠকের প্রতি লক্ষ রেখেই এটি রচনা করেছেন এবং নবিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয়ই সংক্ষেপে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে গ্রন্থটি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হাজার হাজার মাদরাসার পাঠ্যতালিকায় কয়েক যুগ ধরে পঠিত হয়ে আসছে।

শেষ কথা, দূরের হয়েও আপনজনের মতো একরকম অভিভাবকত্ব দিয়ে আসা মুহতারাম আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় মূলত এ কাজে এগিয়ে আসা। আল্লাহ তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে দিন। এ ছাড়া গ্রন্থটির অনুবাদকাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়েছি মুহাক্কিক আলিম মুফতি নোমান আহমদ, মুফতি মহিউদ্দিন কাসেমী, বন্ধুবর মাওলানা শুয়াইবুর রহমান ও মাওলানা শামছুল হক ইবনে সিরাজের। এ ছাড়া মুফতি আলী হাসান উসামা ভাইও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা যুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা লেখক, প্রকাশক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন।

গ্রন্থটির মূল লেখক মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.-এর ভাষায় আমিও বলি, 'নবিজির জীবনী নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, আল্লাহর কাছে যখন তাঁদের তালিকা তুলে ধরা হবে, তখন সে তালিকায় যেন অধমের নামটিও যুক্ত হয়।'

ইলিয়াস মশহুদ
৩০ অক্টোবর ২০২১

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কিজীবন # ৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

নবিজির মাদানি জীবন # ৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

নবিজির যুদ্ধজীবন

প্রথম হিজরি

দ্বিতীয় হিজরি

তৃতীয় হিজরি

চতুর্থ হিজরি

পঞ্চম হিজরি

ষষ্ঠ হিজরি

হুদায়বিয়ার সন্ধি, বায়আতে রিজওয়ান এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত # ১০৩

সপ্তম হিজরি

খায়বারযুদ্ধ, ফাদাক বিজয় এবং কাজা উমরা আদায় # ১০৬

অষ্টম হিজরি

সারিয়ায়ে মুতা, মক্কাবিজয়, হুনাইন ও তায়েফযুদ্ধ এবং উমরায়ে জিইররানা # ১০৮

নবম হিজরি

তাবুকযুদ্ধ, ইসলামি হজ, বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামগ্রহণ # ১১৩

ভূমিকা

উভয় জাহানের নেতা, সৃষ্টিজগতের অহংকার, দুনিয়া-আখিরাত সৃষ্টির উপলক্ষ্য বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনচরিত পড়া ও পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাই যখন থেকে মুসলিমসমাজে সাহিত্যরচনা ও গ্রন্থ সংকলনের ধারা শুরু হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের আলিমরা আপনাপন ভাষায় নিজস্ব ভঙ্গিতে অসংখ্য সিরাতগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে যে আরও কত হাজার গ্রন্থ রচিত হবে, সেটি আল্লাহই ভালো জানেন। কবি বলেন,

যে বাগানে গেয়ে যায় গান হাজারো বুলবুলি
সে বাগানে আমিও তাদের সাথে সুর তুলি।

শুধু যে মুসলিম লেখকগণ নবিজির জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন তা নয়; বরং হাজার হাজার অমুসলিম লেখকও তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল অমুসলিম লেখক কর্তৃক নবিজীবন নিয়ে লেখা ২০-৩০টি গ্রন্থ সম্পর্কে তো আমারই জানা আছে। যদিও তারা বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এ জন্য তাদের লেখা জীবনীগ্রন্থ পাঠ করা থেকে সাধারণ মুসলিমদের বিরত থাকা উচিত। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত নবিজির জীবনী রচনায় যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো মানুষের ক্ষেত্রে তার কিয়দংশও হয়নি।

ইউরোপীয় এক সিরাত-লেখক বলেন, 'মুহাম্মাদের জীবনী-লেখকদের ধারা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তা কখনো শেষ হওয়ার মতো নয়। তবে নবিজির জীবনী-লেখকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং এ মহৎ কাজে জড়িত হতে পারা যে-কারও জন্য গর্বের বিষয়।'[১]

উর্দু ভাষায় সিরাত-বিষয়ে নতুন ও পুরাতন অনেক গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো হিন্দুস্থানের আলিমগণ রচনা করে তাঁদের কর্তব্য আদায় করেছেন; কিন্তু এর পরও আমার

[১] *সিরাতুন নাবি* ﷺ।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি অনেক দিন ধরে সংক্ষিপ্ত এমন একটি সিরাতগ্রন্থ খুঁজে ফিরছিল, কর্মব্যস্ত নারী-পুরুষ মাত্র দু-তিন বৈঠকে যেটি পড়ে ফেলতে পারবে। এর মাধ্যমে নিজেদের ইমান-আমল সতেজ করতে পারবে এবং নববি আদর্শকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারবে। পাশাপাশি গ্রন্থটি ইসলামি সংগঠন ও মাদরাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থাৎ, আমি এমন একটি গ্রন্থ খুঁজে ফিরছিলাম, যাতে সংক্ষেপে অথচ সতর্কতার সঙ্গে নবিজীবনের পূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করা হবে; কিন্তু উর্দু ভাষায় এমন কোনো গ্রন্থ আমার নজরে পড়েনি।

ইতিমধ্যে সিমলার[১] আমার কজন বন্ধু তাঁদের ইসলামি সংগঠনের জন্য এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমাকে এ কাজটি করে দিতে অনুরোধ জানান। ফলে মনের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ জ্ঞানের স্বল্পতা আর দীনি ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ আশা নিয়ে কলম ধরেছি যে, আল্লাহর কাছে যখন নবিজির জীবনীকারদের তালিকা তুলে ধরা হবে, তখন সে তালিকায় অধমের নামটিও যুক্ত হবে। কবি বলেন,

বুলবুলি তো শুধু ফুলের ঘ্রাণ নিতেই গান গেয়ে যায়।

এ জন্য মহান একটি উদ্দেশ্যে রাসুল ﷺ-এর জীবনচরিত নিয়ে গ্রন্থটি লেখা শুরু করি। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থের সারসংক্ষেপ যুক্ত করেছি :

১. গ্রন্থটির কলেবর যাতে দীর্ঘ না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। এ জন্য আরবের ভৌগোলিক বিবরণ, ইসলামপূর্ব আরব-আজমের সার্বিক পরিস্থিতি—যেগুলো নবিজীবনের সঙ্গে সাধারণত উল্লেখ করা হয় এবং তাঁর জীবনালোচনার সঙ্গে এগুলো উপকারীও—সেগুলো আলোচনা না করে রাসুল ﷺ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেগুলো সম্পর্কযুক্ত, শুধু সেসব বিষয় ও অবস্থা তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করেছি। ফলে এভাবে সংক্ষেপণ-নীতি অবলম্বনের কারণে এই গ্রন্থের অপর নাম দিয়েছি *আওজাজুস সিয়ার লিখাইরিল বাশার* বা সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।

২. গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও নবিজীবনের সার্বিক পরিস্থিতি যেন পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে, এ জন্য সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয় ও ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে।

৩. নবিজীবনের বিভিন্ন যুদ্ধ ও তাঁর বহুবিয়ে সম্পর্কে ইসলামবিরোধীদের

[১] সিমলা উত্তর-ভারতের হিমাচল প্রদেশের একটি ছোট রাজ্য। —অনুবাদক।

বিভ্রান্তিকর যেসব বক্তব্য রয়েছে, সেসব বিষয়ে মোটামুটি হলেও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৪. এ ছাড়া গ্রন্থটির মূল উৎস হচ্ছে সিরাতের নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ। এগুলোর উদ্ধৃতি যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : ১. *মিশকাতুল মাসাবিহ*, ২. *সহিহ বুখারি*, ৩. *সহিহ মুসলিম*, ৪. *সুনানুন নাসায়ি*, ৫. *সুনানু আবি দাউদ*, ৬. *সুনানুত তিরমিজি*, ৭. *সুনানু ইবনি মাজাহ* এবং সিহাহসিত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ, ৮. *কানজুল উম্মাল*, ৯. *খাসায়িসুল কুবরা* (আল্লামা সুয়ুতি রাহ.), ১০. *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, ১১. *সিরাতে মুগলতাই*, ১২. *সিরাতু ইবনি হিশাম*, ১৩. কাজি ইয়াজ রাহ.-এর *শিফা শরহে খাফফাজিসহ*, ১৪. *সিরাতে হালাবিয়া*, ১৫. *জাদুল মাআদ* (আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহ.), ১৬. *তারিখু ইবনি আসাকির*, ১৭. *সুরুরুল মাহজুন* (শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ.), ১৮. *আওজাজুস সিয়ার* (শায়খ আহমাদ ইবনু ফারিস রাহ.), ১৯. *নাশরুত তিব* (আশরাফ আলি থানবি রাহ.)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার ক্ষুদ্র এ প্রয়াস কবুল করেছেন, এ জন্য তাঁর দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রথমেই আমার শায়খ হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি গ্রন্থটি পছন্দ করে তাঁর খানকায়ে ইমদাদিয়ার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেন। ফলে গ্রন্থটি প্রকাশের মাত্র তিন মাসেই পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ও বাংলার শতাধিক মাদরাসা ও ইসলামি সংগঠন তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর।

মুহাম্মাদ শফি
২৮ জিলহজ ১৩৪৪

প্রথম অধ্যায়

নবিজির বংশপরিচিতি, জন্ম ও শৈশব

এক. নবিজির বংশপরিচিতি

নবিজি ﷺ-এর পবিত্র বংশধারা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল।[৩] এটি এমন এক বাস্তব সত্য যে, মক্কার সকল কাফির এমনকি তাঁর চরম শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারেনি। আবু সুফিয়ান রা. ইসলামগ্রহণের আগে রোম সম্রাটের সামনে এ সত্য গোপন করতে পারেননি; বরং সত্যটাই স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে। অথচ তখন তিনি মনে মনে চাচ্ছিলেন, যদি কোনো সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে নবিজির ওপর কোনো না কোনো দোষ চাপাবেন।

দুই. নবিজির বংশধারা

১. পিতার দিক থেকে নবিজির বংশপরিক্রমা

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কাআব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নাজার[৪] ইবনু কিনানা ইবনু খুজায়মা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলয়াস ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।

এ পর্যন্ত নবিজির বংশধারা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। এর পর থেকে আদম আ. পর্যন্ত তাঁর বংশধারা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তাই সেটুকু আর উল্লেখ করা হলো না।

২. মায়ের দিক থেকে নবিজির বংশপরিক্রমা

মুহাম্মাদ ইবনু আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনু জুহরা ইবনু কিলাব।

---

[৩] দালায়িলে আবু নায়িমে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে; জিবরিল আ. বলেছেন, 'আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত সফর করেছি; কিন্তু বনু হাশিমের চেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল কোনো বংশ দেখিনি।' *মাওয়াহিব।*

[৪] ইবনু হিশামের মতে, নাজারের অপর নাম কুরাইশ। তাঁর বংশধররাই 'কুরাইশি' বলে খ্যাত। তাঁর বংশোদ্ভূত না হলে কাউকে কুরাইশি বলা যায় না। তবে অনেকে বলেন, ফিহর ইবনু মালিকের অপর নাম কুরাইশ। —*অনুবাদক।*

উপরিউক্ত আলোচনার পর জানা গেল যে, কিলাব ইবনু মুররা পর্যন্ত পিতা-মাতার দিক থেকে বংশপরিক্রমা ভিন্ন হলেও এর পর থেকে একসঙ্গে মিলে গেছে।

তিন. নবিজির জন্মপূর্ব বরকতের সুবাস

প্রভাত হওয়ার আগে সুবহে সাদিকের আলো এবং রক্তিম পুবাকাশ যেমন পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল সূর্যোদয়ের জানান দেয়, তেমনি নবুওয়াতি সূর্যের উদয়-মুহূর্ত যখন একেবারে নিকটে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, যা নবিজির শুভ জন্মের আগমনী-সংবাদ দিচ্ছিল। মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় সেগুলোকে 'ইরহাসাত' বা অপেক্ষমাণ নিদর্শন বলা হয়।

নবিজি ﷺ-এর সম্মানিত মা আমিনা থেকে বর্ণিত; নবিজি ﷺ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে, তখন আমিনাকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেওয়া হয়—'তোমার গর্ভে যে শিশু রয়েছে, সে এ উম্মাহর নেতা হবে। শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে, তখন তুমি এ দুআ করবে—"আমি তাঁকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি" এবং তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ।'

আমিনা আরও বলেন, মুহাম্মাদ যখন আমার গর্ভে আসেন, তখন আমি একবার এমন একটি আলো দেখতে পাই, যে আলোতে শামের বসরা শহরের বড় বড় প্রাসাদ আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল![৫]

তিনি আরও বলেন, আমি এমন কোনো মহিলাকে দেখিনি, যারা গর্ভবতী হয়ে আমার মতো এত হালকা ও সহজবোধ করেছেন। কেননা, গর্ভে সন্তান থাকলে মহিলাদের যে বমি বমি ভাব, অসুস্থতা-অলসতা ইত্যাদি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, আমার ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয়নি। এ ছাড়া এমন আরও অসংখ্য ঘটনা নবিজির জন্মের আগে প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো এই ছোট গ্রন্থে উল্লেখের সুযোগ নেই।

চার. নবিজির জন্ম

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নবিজি ﷺ সে বছরের রবিউল আউয়ালে জন্মান, যে বছর 'আসহাবে ফিল' বা আবরাহার হস্তিবাহিনী পবিত্র কাবায় হামলা করতে এসেছিল।[৬] তবে আল্লাহ তাআলা কতিপয় ক্ষুদ্র আবাবিলের মাধ্যমে পাথরকণা নিক্ষেপ করে তাদের পরাস্ত করেছিলেন। কুরআনেও এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। মূলত এ

---

৫ *সিরাতু ইবনি হিশাম।*

৬ নবিজির জন্মের সঙ্গে হস্তিবর্ষ বা হাতিবাহিনীর ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। এটা হলো সুরা ফিলে বর্ণিত ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক কাবাঘর ধ্বংস করার অভিযানের বছরের কথা। বেশির ভাগ সিরাত-রচয়িতার অভিমত অনুযায়ী, এ ঘটনা নবিজির জন্মের ৫০ অথবা ৫৫ দিন আগে ঘটেছিল।

ঘটনা নবিজির জন্মপূর্ব বরকতের সূচনা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। নবিজি ﷺ যে ঘরে জন্মান, পরবর্তী সময়ে সে ঘর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের অধিকারে এসেছিল।[৭]

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ লিখেছেন, হস্তিবাহিনীর ঘটনা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ঘটেছিল।[৮] এর মাধ্যমে জানা গেল যে, ইসা আ.-এর জন্মের ৫৭১ বছর পর নবিজির জন্ম হয়।

ইবনু আসাকির[৯] রাহ. পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, আদম ও নুহ আ.-এর মধ্যখানে ১ হাজার ২০০ বছরের ব্যবধান ছিল। নুহ আ. ও ইবরাহিম আ.-এর মধ্যখানে ছিল ১ হাজার ১৪২ বছরের ব্যবধান। ইবরাহিম থেকে মুসা আ. পর্যন্ত ৫৬৫ বছরের। মুসা থেকে দাউদ আ. পর্যন্ত ৫৬৯ বছরের। দাউদ থেকে ইসা আ. পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৬ বছর এবং ইসা আ. থেকে শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত ৬০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

এ হিসাবে আদম থেকে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩২ বছরের ব্যবধান ছিল। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আদম আ.-এর বয়স হয়েছিল ৯৬০ বছর। তাই আদম আ.-এর পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ৬ হাজার বছর পর অর্থাৎ, সপ্তম সহস্রাব্দে নবিজির জন্ম হয়।[১০]

মোটকথা, আসহাবে ফিল কাবায় আক্রমণের বছরের ১২ রবিউল আউয়াল[১১] সোমবার পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য এক দিন ছিল; যে দিন পৃথিবী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, দিন ও রাতের পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য, আদম আ. ও তাঁর সন্তানদের গৌরব, নুহ আ.-

---

[৭] *সিরাতে মুগলতাই* : ৫।

[৮] *দুরুসুত তারিখিল ইসলামি* : ১৪।

[৯] এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে, তবে ইবনু আসাকির এ বর্ণনাটি সঠিক বলেছেন।

[১০] মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে *তারিখু ইবনি আসাকির* : ১/১৯-২০। (আদম আ. থেকে নবিজি ﷺ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান-সংক্রান্ত যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এই বর্ণনার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইমাম ইবনু হাজমের *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* গ্রন্থ দেখতে পারেন। —*অনুবাদক*।)

[১১] এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নবিজির জন্ম রবিউল আউয়ালের সোমবার দিনে হয়েছিল; কিন্তু কোন তারিখে, সেটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে জন্মতারিখ নিয়ে চারটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে—২, ৮, ১০ ও ১২ রবিউল আউয়াল। হাফিজ মুগলতাই রাহ. ২ তারিখকে গ্রহণ করে অন্যগুলোকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ১২ তারিখের বর্ণনা। ইবনু ইসহাকও এ তারিখ গ্রহণ করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. ১২ তারিখের বর্ণনার ওপর সবাই একমত বলে দাবি করেছেন। এমনকি আল্লামা ইবনুল আসির তাঁর *আল কামিল ফিত তারিখ* গ্রন্থে এ তারিখই গ্রহণ করেছেন। গবেষক মাহমুদ পাশা মিসরি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে ৯ তারিখ গ্রহণ করেছেন। এটি সবার মতের বিপরীত এবং সূত্রবিহীন উক্তি। যেহেতু চাঁদ উদয়ের স্থান বিভিন্ন, তাই গণনার ওপর এতটুকু বিশ্বাস ও নির্ভরতা জন্মায় না যে, এর ওপর ভিত্তি করে সবার বিরোধিতা করা যাবে।

এর কিশতি রক্ষার মূল রহস্য, ইবরাহিম খলিলুল্লাহর দুআ, মুসা ও ইসা আ.-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ, আমাদের নবিজি ﷺ এ ধরায় শুভাগমন করেন।

তখন একদিকে পৃথিবীতে নববি সূর্যের আলোকরশ্মি কিরণ ছড়ায়, অন্যদিকে পারস্য-সাম্রাজ্যে কিসরার শাহি প্রাসাদে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হয়। এর ফলে কিসরার শাহি প্রাসাদের ১৪টি চূড়া[১২] ভূপাতিত হয়। পারস্যের সাওয়া উপসাগর আচমকা শুকিয়ে যায়। এ ছাড়া পারস্যের সেই অগ্নিকুণ্ড, যা ১ হাজার বছর ধরে একমুহূর্তের জন্যও নেভেনি, তা-ও নিজ থেকেই নিভে যায়।[১৩]

বস্তুত, এসব ঘটনা ছিল অগ্নিপূজা এবং সর্বপ্রকার অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির পরিসমাপ্তির সূচনা। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য পতনের ইঙ্গিত।

সহিহ হাদিসে[১৪] বর্ণিত আছে, নবিজির জন্মের সময় তাঁর সম্মানিত মায়ের উদর থেকে এমন একটি নুর প্রকাশিত হয়েছিল, যার আলোয় পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়। এ ছাড়া কোনো বর্ণনায় রয়েছে, নবিজি ﷺ তাঁর জন্মের সময় দুহাতের ওপর ভর দেওয়া ছিলেন। এরপর হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে আকাশের দিকে তাকান।[১৫]

পাঁচ. পিতা আবদুল্লাহর ইনতিকাল

নবিজি ﷺ-এর তখনো জন্ম হয়নি, পিতা আবদুল্লাহকে তাঁর পিতা (নবিজির দাদা) আবদুল মুত্তালিব মদিনা থেকে খেজুর নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ তখন পিতার নির্দেশে নবিজিকে স্ত্রীগর্ভে রেখে মদিনায় যান।[১৬] ঘটনাক্রমে সেখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। ফলে জন্মের আগেই নবিজির মাথার ওপর থেকে পিতৃছায়া উঠে যায়।

---

[১২] *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া।*

[১৩] *সিরাতে মুগলতাই* : ৫। (রাসুল ﷺ-এর জন্ম-সংক্রান্ত এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা সিরাত ও ইতিহাসের অনেক গ্রন্থে রয়েছে; কিন্তু এগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ তাঁদের রচনায় এসব বর্ণনা উল্লেখ করলেও অনেকে বর্ণনার মান যাচাই করেননি। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মোল্লা আলি কারি রাহ.-এর *আল-মাসনু ফি মারিফাতিল হাদিসিল মাওজু* গ্রন্থের ভূমিকায় শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.-এর আলোচনাটি দেখে নিতে পারেন। এ ছাড়া আল্লামা সাফিউর রাহমান মুবারকপুরি রাহ.-এর *আর-রাহিকুল মাখতুমে*ও এ সংক্রান্ত আলোচনা দেখতে পারেন। — *অনুবাদক।*)

[১৪] ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, ইবনু হিব্বান ও হাকিম এ বর্ণনাকে সহিহ বলেছেন। *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, নাশরুত তিব* : ১/১৮।

[১৫] *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া।*

[১৬] এক বর্ণনায় রয়েছে, নবিজির জন্মের সাত মাস পর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। যদিও *জাদুল মাআদে* ইবনুল কাইয়িম রাহ. এ মতকে দুর্বল বলেছেন।

ছয়. দুধপান ও শৈশব

নবিজির জন্মের পর প্রথমে তাঁর সম্মানিত মা তাঁকে দুধপান করান। এর কিছুদিন পর করান আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা। এরপর এই সৌভাগ্য অর্জন করেন হালিমাতুস সাদিয়া রা.।[১৭]

তখনকার আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের নবজাতককে দুধপান করাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। এর মাধ্যমে শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ভালো থাকত এবং গ্রামের বিশুদ্ধ আরবি ভাষাও তারা সহজে রপ্ত করতে পারত। এ জন্য গ্রামের মহিলারা দুগ্ধপোষ্য শিশু নিতে প্রায়ই শহরে আসত।

নবিজির দুধমা হালিমা সাদিয়া রা. বলেন, 'আমি তায়েফ থেকে সাআদ গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য মক্কার উদ্দেশে রওনা দিই। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন আমার কোলেও দুগ্ধপায়ী এক সন্তান ছিল। তবে আমরা বেশ দরিদ্র্য-পীড়িত ছিলাম। অনাহারের ফলে আমার বুকে এতটুকু দুধ ছিল না যে, আমার কোলের শিশুটি তৃপ্তিতে পান করবে। ফলে শিশুটি সারা রাত ক্ষুধায় ছটফট করত; আর আমরা তার কারণে ঘুমোতে পারতাম না। সারাটি রাত বসে বসে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের একটি উটনী ছিল; কিন্তু সেটিরও তখন দুধ ছিল না। এভাবে কষ্ট ও ক্ষুধায় আমরা দিন কাটাতাম। এতকিছুর পরও আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু নেওয়ার মনস্থ করি।

মক্কার উদ্দেশে রওনার সময় আমি যে গাধায় আরোহণ করি, সেটাও নিতান্ত দুর্বল ছিল। ফলে কাফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। এ জন্য সফরসঙ্গীরা আমাদের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করছিল। এভাবে অনেক কষ্টে একপর্যায়ে আমরা মক্কায় পৌঁছাই।

সেখানে পৌঁছার পর কাফেলার মহিলারা শিশু মুহাম্মাদকে দেখার পর যখন জানতে পারে, তিনি পিতৃহীন ইয়াতিম, তখন কেউ-ই তাঁকে নিতে চায়নি। কেননা, এ ধরনের শিশুকে দুধপান ও লালনপালনে তেমন কোনো পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

এভাবে একে একে মহিলারা চলে যেতে লাগল; আর হালিমার ভাগ্যাকাশে ঝলমল করে নববি কিরণ আলো ছড়ায়। এ সময় তাঁর বুকের দুধস্বল্পতাই তাঁর জন্য রহমত হয়ে আবির্ভূত হয়। কেননা, তাঁর বুকে দুধ কম থাকায় ইতিপূর্বে কেউ তাঁকে সন্তান দিতে রাজি হয়নি।

হালিমা বলেন, 'আমি আমার স্বামীকে বললাম, এত কষ্টের সফরের পর খালি হাতে

---

[১৭] *সিরাতে মুগলতাই* : ৭।

ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এভাবে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বরং এই ইয়াতিম শিশুকে নিয়ে যাওয়াই ভালো। আমার প্রস্তাবে স্বামীও সম্মত হলেন।' এভাবে তাঁরা এই দুর্লভ রত্ন—ইয়াতিম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে বাড়িতে ফেরেন, যে রত্ন-আলোতে শুধু হালিমা-আমিনার ঘর নয়; বরং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো পৃথিবী আলোকিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

আল্লাহ তাআলার রহমতে তখনই হালিমার ভাগ্য খুলে যায়। সৃষ্টির সেরা মানব, ভবিষ্যৎ-নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর কোলে এসে গেলেন। এরপর বিশ্রামের জন্য তাঁবুতে এসে যখন শিশু মুহাম্মাদকে দুধ পান করাতে বসেন, তখন থেকেই বিভিন্ন বরকত প্রকাশ পেতে শুরু করে। ইতিপূর্বে তাঁর বুকে যেখানে দুধ-খরা চলছিল, সেখানে আজ শিশু মুহাম্মাদের বরকতে এই পরিমাণ দুধ এল যে, নবিজি ও তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ উভয়ে তৃপ্তির সঙ্গে উদর পূর্ণ করে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, সেটিরও স্তন দুধে টইটম্বুর!

হালিমা বলেন, আমার স্বামী তখন উটের দুধ দোহন করেন এবং আমরা সবাই তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করি। ফলে অনেক দিন পর সারা রাত আমরা অত্যন্ত আরামে ঘুমিয়ে কাটাই। এখন আমার স্বামীও আমাকে বলতে থাকেন, 'হালিমা, তুমি তো বড় বরকতময় এক শিশু নিয়ে এসেছ!' আমি বলি, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। এ শিশু বরকতপূর্ণ এক শিশু।

এর পর আমরা মক্কা থেকে রওনা দিই। আমি মুহাম্মাদকে নিয়ে সেই গাধায় চড়ি, যেটি আসার সময় চলতে পারছিল না; কিন্তু এবার আল্লাহর কুদরতের খেলা প্রত্যক্ষ করলাম। সেই দুর্বল গাধাটিই ফেরার পথে এত জোরে চলতে লাগল যে, কাফেলার অন্য কারও বাহন এটির ধারেকাছেও আসতে পারছিল না। ফলে আমার সাথি মহিলারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে থাকে, 'এটা কি সেই গাধা, যেটিতে চড়ে তোমরা এসেছিলে?'

এভাবে বরকত ও কুদরতের খেলা দেখতে দেখতে একসময় সফর সমাপ্ত হলো। তায়েফ থেকে মক্কা হয়ে আবারও তায়েফে নিজ নিজ বাড়িতে এলাম সবাই। তায়েফে তখনো দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুধের পশুগুলো ছিল দুধশূন্য; কিন্তু আমরা বাড়িতে ফিরতেই আমাদের বকরিগুলোর স্তন দুধে ভরে ওঠে। এখন প্রতিদিনই আমাদের বকরিগুলো মাঠ থেকে দুধভরা স্তনে ফেরে; কিন্তু আশেপাশের অন্য কারও পশুর স্তনে একফোঁটা দুধের দেখা নেই। এ দৃশ্য দেখে আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলতে লাগল, তোমরাও পশুগুলো নিয়ে সেখানে চরাও, যেখানে হালিমার বকরিগুলো চরানো হয়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এখানে চারণক্ষেত্র বা মাঠের কোনো বিশেষত্ব ছিল না; বরং

আট. নবিজির মায়ের ইনতিকাল

নবিজির চার কিংবা ছয় বছর বয়সকালে তাঁর মা নিজের ভাইদের কাছে মদিনায় গিয়েছিলেন। সেখান ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।[২৪]

বল্যকাল। বয়স মাত্র ছয় বছর। পিতৃছায়া তো আগেই উঠে গেছে। এবার মাতৃছায়াও উঠে গেল। তবে এই ইয়াতিম শিশুটি যে রহমতের (আল্লাহর) আশ্রয়ে লালিতপালিত হওয়ার প্রতীক্ষায়, তিনি তো এসব উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষী নন।

নয়. আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল

মা-বাবার পর নবিজি তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে লালিতপালিত হচ্ছিলেন; কিন্তু মহান আল্লাহর এটা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এ বালক তাঁর রহমতের কোলেই প্রতিপালিত হবে। আল্লাহ নিজেই তাঁর লালনপালনের জিম্মাদার হয়েছেন।

নবিজির বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন পূর্ণ হয়, তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

দশ. শাম সফরে নবিজি ﷺ

দাদার ইনতিকালের পর চাচা আবু তালিব নবিজির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। এবার তিনি চাচা আবু তালিবের স্নেহ-ছায়ায় বসবাস করতে থাকেন। এভাবে যখন তাঁর বয়স ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন পূর্ণ হয়, তখন আবু তালিব ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম সফরের ইচ্ছা করেন। সুতরাং নবিজিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শামের পথে রওনা দেন এবং পথিমধ্যে 'তাইমা' নামক স্থানে তাঁরা যাত্রাবিরতি করেন।

এগারো. নবিজি সম্পর্কে এক ইয়াহুদি পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্‌বাণী

চাচা আবু তালিবের সঙ্গে নবিজি তাইমায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, ঘটনাক্রমে 'বুহায়রা রাহিব'[২৫] নামের এক ইয়াহুদি পণ্ডিত সেদিকে যাচ্ছিলেন। তিনি নবিজিকে দেখতে পেয়ে আবু তালিবকে বলেন, 'আপনার সঙ্গের বালকটি কে?' আবু তালিব বলেন, 'আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ।' বুহায়রা বলেন, 'আপনি কি তাঁর প্রতি স্নেহপরবশ এবং তাঁর কল্যাণ কামনা করেন?' আবু তালিব বলেন, 'অবশ্যই, আমি তাঁর প্রতি দয়ালু এবং তাঁর হিফাজতকারী।' তাঁর এমন উত্তরে বুহায়রা তখন আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন,

---

[২৪] *সিরাতে মুগলতাই* : ১০।

[২৫] তাঁর নাম জারজিস, উপাধি ছিল বুহায়রা বা বাহিরা। *সিরাতে মুসতাফা* : ১/১১৬।

'আপনি তাঁকে শামে নিয়ে গেলে সেখানকার ইয়াহুদিরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কেননা, এ ছেলে বড় হয়ে নবি হবে। সে ইয়াহুদিধর্ম রহিত করে দেবে। আমি আমাদের আসমানি কিতাব তাওরাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি!'

এখানে লক্ষণীয় যে, বুহায়রা রাহিব ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। আর তাওরাতে শেষ নবি হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্ণ অবয়ব-আকৃতির বিস্তারিত বিবরণ ছিল। ফলে বুহায়রা তাঁকে দেখেই চিনতে পারেন যে, তিনিই সেই শেষ নবি, যিনি তাওরাত বা ইয়াহুদিধর্ম রহিত এবং ধর্মযাজকদের রাজত্বও শেষ করে দেবেন।[২৬]

পাদরি বুহায়রার কথায় আবু তালিব ভয় পেয়ে যান, তাই সফরের মাঝপথে তাইমা থেকেই নবিজিকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন।[২৭]

বারো. ব্যবসার কাজে দ্বিতীয়বার শাম সফর

ওই সময় মক্কায় খাদিজা নামের একজন মহিয়সী ছিলেন, যাঁর ছিল প্রচুর ধনসম্পদ। পাশাপাশি তিনি ধীমান আর বুদ্ধিমতি হিসেবেও ছিলেন প্রসিদ্ধ। তখনকার মক্কার দরিদ্র পুরুষদের যারা মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বিশ্বাসী হিসেবে খাদিজার জানাশোনা ছিল, তাদের হাতে তিনি অর্থ-সম্পদ দিয়ে বলতেন, 'এগুলো অমুক জায়গায় গিয়ে বিক্রি করবে এবং এর লভ্যাংশ থেকে তোমাকে এ পরিমাণ দেওয়া হবে।'

যদিও নবিজি তখনো নবুওয়াত পাননি, তবে তাঁর আমানতদারিতা, বিশ্বস্থতা ও সত্যবাদিতার কথা সর্বমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই তাঁর উত্তম চরিত্র ও উন্নত গুণাবলির যথেষ্ট মূল্যায়ন করত। মক্কার মানবসমাজে তাঁর সততা ছিল প্রবাদতুল্য। ফলে 'আল আমিন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। তাঁর এই খ্যাতি ও উন্নত মর্যাদার কথা ধীমান খাদিজার অজানা ছিল না। খাদিজা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন। তিনি চাচ্ছিলেন, নবিজির হাতে সম্পদ দিয়ে তাঁর সততা ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে ব্যবসায়

---

[২৬] মক্কার ব্যবসায়ীদল যখন তাইমায় শিবির স্থাপন করে, তখন পাদরি বাহিরা গির্জা থেকে বেরিয়ে তাঁদের কাছে এসে সবাইকে আপ্যায়ন করান। এর আগে কখনো তিনি গির্জা থেকে বেরিয়ে বাণিজ্যিক কোনো কাফেলার সঙ্গে এভাবে সাক্ষাৎ করেননি। পাদরি কিশোর মুহাম্মাদের অবয়ব, আচরণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে তাঁর মধ্যে শেষ নবির নিদর্শন দেখতে পান। তিনি তখন তাঁর হাত ধরে বলেন, 'এ হচ্ছেন বিশ্বজাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্বজাহানের রাসুল মনোনীত করবেন।' কাফেলার লোকজন বলেন, 'আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে তিনিই শেষ নবি?' পাদরি বাহিরা বলেন, 'তোমাদের আসার সময় দূর থেকে আমি দেখেছি এমন কোনো গাছ কিংবা পাথরখণ্ড বাকি ছিল না, যা এই কিশোরকে সিজদা করেনি! আর এই সৃষ্টিরাজি নবি-রাসুল ছাড়া কাউকে কখনো সিজদা করে না! এ ছাড়া তাঁর কাঁধের নিচে 'মোহরে নবুওয়াত' দেখেও আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। আমাদের ধর্মগ্রন্থে এসব তথ্য আগেই পেয়েছিলাম।' *সিরাতে মুসতাফা* : ১/১১৬-১১৭।

[২৭] *সিরাতে মুগলতাই* : ১০।

অধিক মুনাফা অর্জন করবেন। এ আশায় তিনি নবিজির কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন, 'আপনি যদি আমার ব্যবসাপণ্য নিয়ে শামে যান, তাহলে আমার এক দাসকে আপনার খিদমতের জন্য সঙ্গে দেবো এবং ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে অন্যদের যে পরিমাণ দিই, আপনাকে এরচেয়ে বেশি দেবো।'

নবিজি যেহেতু উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, উচ্চ সাহস আর দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন, তাই খাদিজার এমন প্রস্তাব পেয়ে সাড়া দিতে দেরি করেননি। তিনি সফরের জন্য তখনই প্রস্তুত হয়ে যান এবং খাদিজার দাস মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ জিলহজ শামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। শামে পৌঁছে তিনি খাদিজার দেওয়া পণ্যসামগ্রী অধিক লাভে বিক্রি করতে সমর্থ হন। এরপর সেই অর্থ দিয়ে আরও কিছু পণ্য কিনে মক্কায় ফিরে সেগুলো খাদিজার হাতে তুলে দেন। শাম থেকে নিয়ে আসা সেসব পণ্য মক্কায় বিক্রি করে খাদিজাও দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন।

শামে যাওয়ার পথে নবিজি একজায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেখানে 'নাসতুরা' নামের এক ইয়াহুদি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী তাঁকে দেখতে পান। পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থগুলোতে শেষ নবি সম্পর্কে যেসব নিদর্শন বিবৃত হয়েছে, তাঁর মধ্যে সেসব দেখে সেই ইয়াহুদি যাজক নবিজিকে চিনে ফেলেন। তা ছাড়া তিনি আগে থেকেই খাদিজার দাস মায়সারাকে চিনতেন। ফলে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সঙ্গের লোকটি কে?' মায়সারা জবাবে বলেন, 'তিনি মক্কার কুরাইশের সম্ভ্রান্ত এক যুবক।' ইয়াহুদি পণ্ডিত তখন বলেন, 'এই যুবক ভবিষ্যতে নবি হবে।'[২৮]

[২৮] *সিরাতে মুগলতাই : ১১।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবিজির বিয়ে ও সন্তানাদি, চাচা, ফুফু ও পাহারাদার এবং নবিজিকে আল আমিন স্বীকৃতি

এক. খাদিজার সঙ্গে নবিজির বিয়ে

খাদিজা রা. ছিলেন বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মহিলা। তখনকার আরবের ধনাঢ্য এক নারী। নবিজির উত্তম চরিত্রমাধুর্য আর উন্নত বৈশিষ্ট্য দেখে তাঁর অন্তরে নবিজির প্রতি অন্যরকম এক ভালোলাগা অনুভূত হয়। তৈরি হয় প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র ভালোবাসা। ফলে তাঁকে তিনি নিজের করে পেতে চাইলেন। এ জন্য নিজ থেকেই তিনি তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান যে, নবিজি রাজি হলে তাঁর সঙ্গে তিনি বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতে চান।

নবিজি ﷺ খাদিজার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২১[২৯] আর খাদিজার ৪০ বছর। তবে অনেকের মতে, খাদিজা তখন ৪৫ বছরের পৌঢ় নারী ছিলেন।

নবিজির বিয়ে অনুষ্ঠানে চাচা আবু তালিব এবং বনু হাশিম ও বনু মুজারের নেতৃস্থানীয় প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের খুতবা পাঠ করেন আবু তালিব। সে খুতবায় তিনি নবিজি ﷺ সম্পর্কে যেসব কথা বলেন, সেগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আবু তালিব বলেন,

> এ হচ্ছে আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ। সহায়-সম্পদ কম থাকলেও সে উন্নত স্বভাব-চরিত্র এবং অনন্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফলে সমাজের আর দশজনের চেয়ে সে এতটাই ওপরে অবস্থান করছে যে, যদি কাউকে তাঁর বিপরীত দাঁড় করানো হয়, তাহলে সে তার থেকে অনেক উচ্চমর্যাদার অধিকারী প্রমাণিত হবে। কেননা, অর্থসম্পদ হচ্ছে ছায়ার মতো এবং প্রত্যাবর্তনশীল বস্তু; আর এই মুহাম্মাদ—যাঁর বংশমর্যাদা ও আত্মীয়তা সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত—সে খুওয়াইলিদের মেয়ে খাদিজাকে

[২৯] বিয়ের সময় নবিজির বয়স কত ছিল, এ সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন : ২১, ২৩, ২৯ ও ৩০ বছর। *সিরাতে মুগলতাই* : ১৪। তবে *সিরাতে মুসতাফাসহ* অন্যান্য গ্রন্থে ২৫ বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিয়ে করতে যাচ্ছে। তাঁর বিয়ের মোহর থেকে নগদ যা দেবে এবং যা পরে পরিশোধযোগ্য, এর সব আমি প্রদান করব এবং এই দায়িত্ব আমি নিলাম। আল্লাহর কসম, ভবিষ্যতে সে বিপুল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

উপর্যুক্ত খুতবায় আবু তালিব নবিজি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা, নবিজির বয়স তখন মাত্র ২১ বছর। এ বয়সেই তিনি চাচার কাছ থেকে তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বীকৃতি লাভ করেন। এ ছাড়া তখনো তাঁর কাঁধে নবুওয়াতের গুরুভার অর্পিত হয়নি। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আবু তালিব তখনো সেই পুরানো ধর্মমত ও বাপদাদার রীতি-বিশ্বাসে অটল ছিলেন, যে ধর্মমত ও রীতি নির্মূল করতে নবিজি ﷺ তাঁর সারাটি জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, সত্য কখনো গোপন রাখা যায় না, কোনো না কোনোভাবে একসময় তা প্রকাশ হবেই।

মোটকথা, খাদিজার সঙ্গে নবিজির বরকতময় বিয়ে সম্পন্ন হয়। তিনি নবিজির সান্নিধ্যে দীর্ঘ ২৪ বছর অতিবাহিত করেন। এর মধ্যে কিছু সময় ওহি নাজিলের আগে এবং কিছু সময় পরে। বরকতময় দাম্পত্যজীবনের দীর্ঘ এ সময়ে নবিজি ﷺ অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেননি।

দুই. খাদিজার গর্ভে নবিজির সন্তানাদি

খাদিজা রা.-এর গর্ভে নবিজির ছয়জন সন্তান জন্ম নেন। তন্মধ্যে দুজন ছেলে আর চারজন মেয়ে। ছেলে দুজনের নাম কাসিম ও তাহির। কাসিমের নামানুসারেই নবিজির উপনাম ছিল 'আবুল কাসিম'। আর তাহির সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ।[৩০]

মেয়ে চারজনের নাম : ১. ফাতিমা, ২. জায়নাব, ৩. রুকাইয়া ও ৪. উম্মু কুলসুম রা.। তাঁদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন জায়নাব রা.।[৩১]

নবিজির সকল সন্তানই খাদিজার গর্ভজাত। তবে ইবরাহিম নামে তাঁর তৃতীয় একজন ছেলে ছিলেন, যিনি মারিয়া কিবতিয়া রা.[৩২]-এর গর্ভে জন্মান। তাঁর এই তিন

---

[৩০] *জাদুল মাআদ* গ্রন্থে তাহিরের মূল নাম 'আবদুল্লাহ'; আর 'তাইয়িব' ও 'তাহির' তাঁর উপাধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩১] হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহ. তাঁর *জাদুল মাআদে* এ সম্পর্কে অনেক মত উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউ জায়নাবকে, কেউ রুকাইয়াকে আবার কেউ উম্মু কুলসুমকে সবার বড় বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবিকন্যাদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন রুকাইয়া আর সবার ছোট ছিলেন উম্মু কুলসুম রা.। *জাদুল মাআদ* : ১/২৫।

[৩২] মারিয়া কিবতিয়া রা.-কে বাদশাহ মুকাওকিস নবিজিকে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন। মুকাওকিসের পুরো নাম জুরাইজ ইবনু মাতা; আর মুকাওকিস হচ্ছে উপাধি। তিনি মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন।

পুত্রসন্তানের সবাই শৈশবে ইনতিকাল করেন। তবে কাসিম সম্পর্কে কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বাহনে চড়ার বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।[৩৩]

তিন. নবিজির চার কন্যা

১. ফাতিমা

এ বিষয়ে উম্মাহর সবাই একমত যে, নবিকন্যাদের মধ্যে ফাতিমা রা. মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। খোদ নবিজি ﷺ তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, 'ফাতিমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার।'[৩৪]

দ্বিতীয় হিজরির জিলহজে আলি রা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়েতে ৪৮০ দিরহাম বা প্রায় ১৫ ভরি ওজনের রুপার সমান মোহর হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। ফাতিমার বিয়ের সময় নবিজি ﷺ তাঁর সঙ্গে যেসব জিনিসপত্র দিয়েছিলেন, সেগুলো হচ্ছে : একটি চাদর, খেজুরের ছালভরতি একটি বালিশ, চামড়ার একটি গদি, দড়ির একটি খাট, চামড়া নির্মিত একটি পানির পাত্র এবং আটা পেষার একটি চাক্কি।[৩৫] ফাতিমা রা. ঘরের সব কাজকর্ম নিজ হাতেই করতেন।

এই হচ্ছে জান্নাতি মহিলাদের সরদার, নবিদুলালি ফাতিমা রা.-এর বিয়ে, মোহর, জাহিজ বা উপহারের[৩৬] বিবরণ এবং তাঁদের দীনতাপূর্ণ জীবনের বাস্তব চিত্র। এসব দেখে কি

রাসুল ﷺ তাঁর কাছেও একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আল্লামা মানসুরপুরি রাহ. তাঁর *রাহমতুল লিল আলামিন* গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠা তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ড. হামিদুল্লাহ তাঁর *রাসুলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন* গ্রন্থে এই বাদশাহর নাম 'বনি ইয়ামিন' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র. *আর রাহিকুল মাখতুম, আল্লামা সাফিউর রাহমান মুবারকপুরি রাহ.*।

[৩৩] *সিরাতে মুগলতাই।*

[৩৪] *সহিহ বুখারি* : ৩৬২৪।

[৩৫] *তাবাকাতু ইবনি সাআদ* এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

[৩৬] সাধারণভাবে 'জাহিজ'-এর বাংলা অনুবাদ করা হয় যৌতুক। রাসুল ﷺ তাঁর আদরের মেয়ে ফাতিমা রা.-এর বিয়ের সময় যে 'জাহিজ' দিয়েছিলেন, হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থাদিতে এর বর্ণনা রয়েছে। এ থেকে সরল চিন্তার অনেকে বলে ফেলেন, নবিজিও তো যৌতুক দিয়েছেন। এখানে জাহিজের স্বরূপের চেয়ে শব্দের ভ্রান্তিটাই তালগোল পাকিয়েছে।

জাহিজের ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত উপহারের ঘটনা। তবে আমাদের উপমহাদেশীয় প্রচলন এবং এ যুগের যৌতুকের ঘটনা হচ্ছে শর্ত করে, ধার্য করে উসুল করার নির্মমতার নমুনা। শুধু শব্দের মিলের কারণে দুটি বিষয়কে এক রকম মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তিকর। উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ এক রকম হলেও স্বরূপ ও তাৎপর্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। *দ্র. মাসিক আল কাউসার*, জুন ২০১১, লেখক : মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ।

সুতরাং পবিত্র কুরআন-হাদিস পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিয়েতে স্বামী স্ত্রীকে মোহর দিতে বাধ্য। এ ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বামী স্ত্রীকে যেকোনো জিনিস দিতেই পারে। দেওয়াটা বৈধ। কিন্তু স্বামী স্ত্রী বা স্ত্রীর পক্ষের কাছে কিছু পাওয়ার আশা করতে পারে না। শর্তারোপ করে নেওয়া তো সম্পূর্ণ হারাম। ফাতিমা রা.-এর বিয়েতে নবিজি যেসব জিনিস উপহার দিয়েছিলেন, এগুলোকে কেউ কেউ যৌতুক গণ্য করেন এবং

সে-সকল নারী লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হবে না, যারা বিয়েশাদিতে অনৈসলামিক বিভিন্ন প্রথা পালন করতে গিয়ে নিজেদের দীন ও দুনিয়া উভয়টাই নষ্ট করে দেন!

নবিজির তিনজন পুত্রসন্তানের কেউ-ই বেঁচে থাকেননি। এতে হয়তো আল্লাহর অপার কোনো রহস্য রয়েছে। ফলে শুধু কন্যাসন্তানের মাধ্যমেই নবিজির বংশধারা বিস্তৃত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আবার শুধু ফাতিমা রা.-এর সন্তানরাই দীর্ঘজীবন লাভ করেন। অন্য কারও কোনো সন্তানই হয়নি বা হলেও বেঁচে থাকেননি। ফাতিমার গর্ভে তিনজন ছেলে ও দুজন মেয়ে জন্মান—হাসান, হুসাইন ও মুহসিন। মুহসিন ছোট থাকতেই মারা যান। ফলে হাসান ও হুসাইনের মাধ্যমে নবিজির বংশধারা বিস্তার হয়েছে। তাঁর মেয়ে দুজন ছিলেন—উম্মু কুলসুম ও জায়নাব।

ফাতিমা রা. নবিজির মৃত্যুর ছয় মাস[৩৭] পর অর্থাৎ, ১১ হিজরির জামাদিউল উলার ১৩ তারিখে, ওয়াকিদির মতে ৩ রমজান; কারও মতে জামাদিউস সানির ৩ তারিখে ইনতিকাল করেন।

২. জায়নাব

নবিজির বয়স যখন ৩০ বছর (৬০১ খ্রিস্টাব্দ), তখন তিনি জন্মান।[৩৮] নবিজি ﷺ তাঁকে আবুল আস ইবনু রাবির সঙ্গে বিয়ে দেন। তাঁর গর্ভে আলি নামে এক ছেলে আর উমামা নামে এক মেয়ে হয়। তবে আলি অল্পবয়সেই মারা যান। ফাতিমা রা.-এর ইনতিকালের পর আলি রা. উমামাকে বিয়ে করেন। তবে উমামার গর্ভে কোনো সন্তান হয়নি। জায়নাব রা. অষ্টম হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৩. রুকাইয়া

নবিজির বয়স যখন ৩৩ বছর, তখন রুকাইয়া রা. জন্মগ্রহণ করেন। উসমান রা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।[৩৯] উসমান রা. যখন হাবশায় হিজরত করেন, তখন রুকাইয়া রা.-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরিতে বদরের যুদ্ধ শেষে নবিজি যখন মদিনায়

এর মাধ্যমে যৌতুক-বৈধতার প্রমাণ খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াস পান। কেননা, নবিজি ফাতিমার বিয়েতে যেসব জিনিস দিয়েছিলেন, তা আলির সম্পদ থেকেই দিয়েছিলেন। দ্র. *দৈনিক কালের কণ্ঠ (যৌতুকপ্রথা বন্ধে হজরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অবদান*, লেখক : মুফতি মুতীউর রাহমান) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

[৩৭] নবিজির ইনতিকালের কত দিন পর তিনি ইনতিকাল করেন, এ সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। যেমন : ৭০ দিন, দুই মাস, চার মাস এবং আট মাস। ফাতিমার জন্ম যদি নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে ধরা হয়, তাহলে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৯ বছর। *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/১২৭।

[৩৮] *সিরাতু ইবনি ইসহাক।*

[৩৯] প্রথমে আবু লাহাবের ছেলে উতবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়; কিন্তু নবুওয়াতকে কেন্দ্র করে বাসরের আগে উতবা তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর উসমান রা. তাঁকে বিয়ে করেন। —*অনুবাদক।*

ফিরছিলেন, তখন রুকাইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইনতিকাল করেন। তিনি দু-বার হিজরত করেছেন—প্রথমে হাবশায় এরপর মদিনায়।

৪. উম্মু কুলসুম

তাঁর মূল নাম জানা যায়নি। তিনি 'উম্মু কুলসুম' (কলুসুমের মা) উপনামেই পরিচিত। রুকাইয়া রা. মারা যাওয়ার পর তৃতীয় হিজরিতে উসমান রা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।[৪০] এ জন্য উসমানের উপাধি ছিল 'জুননুরাইন' বা দুই নুরের অধিকারী। উম্মু কুলসুমের কোনো সন্তান হয়নি। তিনি নবম হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের পর নবিজি বলেন, 'আমার যদি আর কোনো মেয়ে থাকত, তবে তাকেও আমি উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিতাম।'[৪১]

মহিলাদের জন্য স্মরণীয় : সিরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় রয়েছে, রুকাইয়া রা. একবার স্বামী উসমানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নবিজির কাছে অভিযোগ করতে এলে নবিজি ﷺ বলেন, 'নারীরা তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, এটা আমি পছন্দ করি না। তুমি ঘরে ফিরে যাও।' এ হচ্ছে মেয়েদের প্রতি পিতার শিক্ষার নমুনা।[৪২]

চার. নবিজির পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ

নবিজির মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় দুজন ইনতিকাল করেন—খাদিজা ও জায়নাব বিনতু খুজায়মা হিলালিয়া রা.। বাকি নয়জন তাঁর ইনতিকালের সময় জীবিত ছিলেন। তবে একসঙ্গে চারজনের অধিক বিয়ের বিষয়টি শুধু নবিজির অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, এ ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা রয়েছে। তাঁর বৈশিষ্ট্যের এসব কারণ সামনে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

১. খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ

তাঁর জীবদ্দশায় নবিজি ﷺ অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেননি।[৪৩] হিজরতের তিন বছর আগে ৬৫ বছর বয়সে—তখন নবিজির বয়স ছিল ৪৯ বছর—তিনি ইনতিকাল

---

[৪০] উম্মু কুলসুমেরও প্রথম বিয়ে হয় আবু লাহাবের ছেলে উতাইবার সঙ্গে; কিন্তু একই কারণে উতাইবাও তাঁকে তালাক দেয়। এরপর বোন রুকাইয়া রা.-এর ইনতিকালের পর উসমান রা. তাঁকে বিয়ে করেন। —*অনুবাদক।*

[৪১] *সিরাতে মুগলতাই* : ১৬-১৭।

[৪২] *আওজাজুস সিয়ার*, ইবনুল ফারিস রাহ.।

[৪৩] নবিজির সঙ্গে বিয়ের আগে তাঁর আরও দু-বার বিয়ে হয়েছিল। প্রথমে আতিক ইবনু আবিদের সঙ্গে। এই তরফে আবদুল্লাহ নামে এক ছেলে ও হিন্দ নামে এক মেয়ে জন্ম নেয়। হিন্দ মুসলমান হয়েছেন। আতিকের মৃত্যুর পরে তিনি আবু হালা ইবনু নাবাশ ইবনু জারারা তামিমিকে বিয়ে করেন। এ পক্ষে হিন্দ ও হালা নামে দুজন ছেলেসন্তান জন্ম নেন এবং উভয়েই মুসলমান হন। —*সিরাতু ইবনি হিশাম* : ২/৬৪৪।

করেন। একই বছর আবু তালিবও মারা যান। তাই এ-বছরকে 'আমুল হুজন' বা 'শোকের বছর' বলা হয়।

খাদিজার ইনতিকালের পর নবিজি ﷺ আরও কয়েকজন সচ্চরিত্র মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁরা হচ্ছেন : ২. সাওদা বিনতু জামআ রা., ৩. আয়েশা বিনতু আবু বকর, ৪. হাফসা বিনতু উমর, ৫. জায়নাব বিনতু খুজায়মা, ৬. উম্মু সালামা, ৭. জায়নাব বিনতু জাহাশ, ৮. জুওয়াইরিয়া, ৯. উম্মু হাবিবা, ১০. সাফিয়া, ১১. মাইমুনা রাজিআল্লাহু আনহুম.।

২. সাওদা বিনতু জামআ

খাদিজার ইনতিকালের পর নবিজি ﷺ সাওদা বিনতু জামআকে বিয়ে করেন। এর আগে তিনি সাকরান ইবনু আমরের বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রথমদিকে ইসলামগ্রহণ করেন এবং হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত করেন। হাবশার মুহাজিরদের সঙ্গে মক্কায় ফেরার পর সাওদার স্বামী মারা যান। এরপর নবিজি তাঁকে বিয়ে করেন। উমর রা.-এর খিলাফতকালের শেষ দিকে তিনি ইনতিকাল করেন।[৪৪] তাঁর থেকে পাঁচটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহিহ বুখারিতে একটি ও সুনানু আরবাআতে চারটি।

৩. আয়েশা সিদ্দিকা

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শাওয়ালে আয়েশা রা. জন্ম নেন[৪৫]; আর দশম বছরে নবিজির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। এর তিন বছর পর তাঁর নয় বছর বয়সে এবং নবিজির মদিনায় হিজরতের সাত মাস পর প্রথম হিজরির শাওয়ালে তাঁর বাসর হয়।[৪৬] আয়েশা রা. হলেন নবিজির একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তাঁর ১৮ বছর বয়সে নবিজি ﷺ ইনতিকাল করেন। মাত্র নয় বছরের নবিসাহচর্য তাঁর ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তিনি কতটুকু অর্জন করেছিলেন, তা সাহাবিদের বিভিন্ন কথা থেকে সহজেই বোঝা যায়।

তিনি ছিলেন উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ নারী এবং নারীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। বড় বড় সাহাবি তাঁর ফাতওয়া গ্রহণ করতেন।[৪৭] তিনি ২ হাজার ২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৪৮] তাঁর সম্পর্কে সাহাবিরা বলতেন, 'কোনো মাসআলায় আমাদের সন্দেহ হলে আমরা আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলে সমাধান পেয়ে যেতাম।' এ কারণে

---

[৪৪] *শারহুজ জুরকানি আলাল মাওয়াহিব* : ৩/২২৩।

[৪৫] *সিরাতে আয়েশা*, সাইয়িদ সুলায়মান নদবি (অনুবাদ : মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম) : ৪৪।

[৪৬] *সহিহ বুখারি* : ৫১৩৩।

[৪৭] *জাদুল মাআদ* : ১/১০৬।

[৪৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়াতুস সাহিহিয়া* : ২/৬৪৯।

প্রসিদ্ধ অনেক সাহাবি তাঁর শিষ্য ছিলেন। ৫৮ হিজরির ১৭ রমজানে ৬৭ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।[৪৯]

৪. হাফসা বিনতু উমর

নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে তিনি জন্ম নেন। তাঁর পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রা., মা জায়নাব বিনতু মাজউন রা.। প্রথমে খুনায়িস ইবনু হুজাফা সাহমি রা.-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এরপর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হিজরিতে নবিজি ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর থেকে ৬০টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ৪৫ হিজরিতে মদিনায় তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. জায়নাব বিনতু খুজায়মা হিলালিয়া

তিনি 'উম্মুল মাসাকিন' বা 'নিঃস্বদের মা' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয় তুফায়িল ইবনু হারিসের সঙ্গে কিন্তু একপর্যায়ে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর তুফায়িলের ভাই উবায়দা রা. তাঁকে বিয়ে করেন। বদরযুদ্ধে উবায়দা শহিদ হলে নবিজি তাঁকে বিয়ে করেন।[৫০] তাঁর সঙ্গে বিয়ের মাত্র দু-মাস পর তিনি ইনতিকাল করেন।[৫১]

৬. উম্মু হাবিবা বিনতু আবু সুফিয়ান

তিনি আবু সুফিয়ান রা.-এর মেয়ে। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় উবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশের সঙ্গে। উবায়দুল্লাহর ঔরসে তাঁর সন্তানও হয়। তাঁরা উভয়ে ইসলামগ্রহণ করে হাবশায় হিজরতও করেন। হাবশায় যাওয়ার পর উবায়ল্লাহ খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তবে উম্মু হাবিবা নিজের ইমানে অটল থাকেন। তখন নবিজি ﷺ হাবশার বাদশাহ নাজাশিকে চিঠি লিখে জানান, তিনি যেন নবিজির পক্ষ থেকে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নবিজির চিঠি পেয়ে বাদশাহ উম্মু হাবিবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং ৪০০ দিনার মোহর তাঁর পক্ষ থেকে আদায় করেন। বিয়েতে তাঁর অভিভাবক ছিলেন খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস রা.। ৪৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর থেকে মোট ৬৫টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

৭. উম্মু সালামা

তাঁর নাম হিন্দা। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয় আবু সালামা ইবনু আবদুল আসাদের সঙ্গে। তাঁদের সন্তানাদিও হয়। স্বামীর সঙ্গে তিনি হাবশা ও মদিনায় হিজরত করেন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ হিজরির জামাদিউস সানিতে নবিজির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ৩৭৮টি হাদিস তিনি বর্ণনা

---

[৪৯] *সিরাতে আয়েশা*, সাইয়িদ সুলায়মান নদবি (অনুবাদ : মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম) : ২২৭।

[৫০] *সিরাতে মুগলতাই* : ৪৯।

[৫১] *নাশরুত তিব।*

করেছেন। কারও মতে ৬৩ হিজরিতে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।[৫২] বলা হয়ে থাকে, উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে তিনিই সবার শেষে ইনতিকাল করেন।[৫৩]

৮. জায়নাব বিনতু জাহাশ

জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. নবিজির ফুফাতো বোন। তাঁর মা উমায়মা বিনতু আবদুল মুত্তালিব। নবিজির আদেশে তিনি জায়েদ ইবনু হারিসার সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবন্ধ হন। জায়েদ ছিলেন নবিজির আজাদকৃত দাস। আজাদের পর তাঁকে নিজের পালক ছেলে করেন নবিজি। জায়েদ যেহেতু 'দাস' ছিলেন, তাই বংশ-গৌরবের কারণে জায়নাব এ বিয়েকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। শুধু নবিজির আদেশ পালনার্থে বিয়েতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। এভাবে প্রায় এক বছর তিনি তাঁর স্ত্রী হিসেবে ছিলেন; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেহেতু হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বা মানসিক বনিবনা হচ্ছিল না, ফলে সবসময় মনোমালিন্য লেগেই থাকত। এমনকি স্ত্রীর মানসিক অস্থিরতার বিষয়টি বুঝতে পেরে খোদ জায়েদ নবিজির কাছে স্ত্রী জায়নাবকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন। তবে নবিজি তাঁকে বুঝিয়ে তা থেকে বিরত রাখতেন। এতকিছুর পরও যখন তাঁদের মধ্যে বনিবনা হয়নি, তখন জায়েদ বাধ্য হয়ে তাঁকে তালাক দেন।

জায়নাব রা. যখন জায়েদের বাহুডোর থেকে মুক্ত হন, তখন নবিজি ﷺ তাঁর সান্ত্বনা ও মনোতুষ্টির জন্য তাঁকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় অন্য একটি বিষয়! তখন আরবসমাজে পালকপুত্রকে ঔরসজাত সন্তানের মতো মনে করা হতো। তাই সমাজের সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রত্যক্ষ করে নবিজি ﷺ তাঁকে আপাতত বিয়ে করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা, তখন হয়তো মানুষ এটা বলাবলি করত যে, তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু এটা যে জাহিলি যুগের একটা কুসংস্কার এবং তা নির্মূল করা ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব, সুতরাং এই কুধারণা মিটিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা কুরআনের একটি আয়াত নাজিল করেন,

﴿وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا﴾

---

[৫২] *শারহুজ জুরকানি আলাল মাওয়াহিব : ৩/২৪১।*

[৫৩] *সিরাতে মুগলতাই : ৫৫।*

> আর স্মরণ করো, আল্লাহ যার ওপর নিয়ামত দিয়েছিলেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তুমি যখন তাকে বলেছিলে, 'তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।' আর তুমি অন্তরে যা গোপন রাখছ, আল্লাহ তা প্রকাশকারী এবং তুমি মানুষকে ভয় করছ অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে; তারপর জায়েদ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়েসম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাঁকে তোমার সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালকপুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বিয়েসম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে। আপনি কি লোকদের ভয় করছেন? অথচ আল্লাহকে ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। [সুরা আহজাব : ৩৭]

চতুর্থ হিজরি, কোনো বর্ণনায় তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরিতে আল্লাহর আদেশে রাসুল ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। মানুষ যাতে এটা বুঝতে পারে যে, পালকপুত্র ঔরসজাত পুত্রের মতো নয়; এমনকি পালকপুত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে গেলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করা পালক পিতার জন্য হারাম নয়। যারা আল্লাহর হালাল এ বিধানকে আকিদা ও আমলের ক্ষেত্রে হারাম করে রেখেছে, তারা যেন ভবিষ্যতে এমনটা আর না করে। জাহিলি যুগের এই কুসংস্কারের ধারাও যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু এই প্রাচীন কুপ্রথা তখনই বন্ধ করা সম্ভব ছিল, যখন নবিজি ﷺ নিজেই কার্যক্ষেত্রে সেটা বাস্তবায়ন করে দেখাবেন।[৫৪]

জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. ২০ হিজরিতে মদিনায় ইনতিকাল করেন। তাঁর থেকে নয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

৯. সাফিয়া বিনতু হুয়াই

সাফিয়া বিনতু হুয়াই রা. প্রথমে কিনানা ইবনু আবিল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন। মুসলিমরা সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয় করলে কিনানা সে যুদ্ধে নিহত হয় এবং সাফিয়া যুদ্ধবন্দি হয়ে মদিনায় আসেন। অথচ তিনি ছিলেন কুরায়জা ও নাজির উভয় গোত্রের

---

[৫৪] জায়নাব রা.-এর বিয়ে সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি, তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকেই লিখেছি। এ বিষয়ের বিশুদ্ধ হাদিসগুলো *সহিহ বুখারির* ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. তাঁর *ফাতহুল বারিতে* সুরা আহজাবের তাফসিরে সংকলন করেছেন। এগুলো ছাড়া যেসব ভ্রান্ত বর্ণনা প্রচার করা হয়েছে, সেগুলো মুনাফিক ও কাফিরদের মনগড়া কাহিনি। সেসব বর্ণাকে অনেক মুসলিম লেখক ও ইতিহাসবিদ কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই নিজেদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; অথচ এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা আর অপবাদ ছাড়া কিছু নয়।

সরদারের মেয়ে এবং হারুন আ.-এর বংশধর। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি এক নবির বংশধর আর আরেক নবির স্ত্রী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরে নবিজি তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন।[৫৫] তিনি মোট ১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ৫০ হিজরির রমজানে তাঁর ইনতিকাল হয়।

১০. জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিস খুজাইয়া

তিনি বনু মুসতালিকের সরদার হারিসের মেয়ে। যুদ্ধবন্দি হিসেবে নবিজির কাছে আসেন। পরে রাসুল ﷺ তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। তিনি তাঁকে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের সবাই মুক্তি পায় এবং তাঁর পিতা মুসলমান হন। জুওয়াইরিয়া ৫০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর থেকে পাঁচটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

১১. মাইমুনা বিনতু হারিস হিলালিয়া

তিনি প্রথমে মাসউদ ইবনু উমরের স্ত্রী ছিলেন। সে তাঁকে তালাক দেওয়ার পর আবু রিহামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আবু রিহামের মৃত্যুর পর সপ্তম হিজরিতে নবিজি তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি নবিজির শেষ স্ত্রী। ৫১ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর থেকে ৭৬টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

পাঁচ. নবিজির বহুবিয়ে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা ইসলামপূর্ব যুগের প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত একটি বিষয় ছিল। আরব, হিন্দুস্থান, ইরান, মিসর, গ্রিস, ব্যাবিলন, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশে বসবাসকারী জাতিসমূহের মধ্যে বহুবিয়ের প্রচলন ছিল। তা ছাড়া এই প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তার কথা আজও কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। বর্তমানে ইউরোপীয়রা তাদের পূর্বপুরুষের বিরুদ্ধে বহুবিয়েকে অবৈধ ঘোষণার প্রয়াস চালিয়েছে, যদিও তারা সফল হতে পারেনি; বরং ইউরোপ-আমেরিকায় আজও বহুবিয়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

প্রখ্যাত খ্রিস্টান পণ্ডিত মি. ডেবিন পোর্ট (Mr. Debian Port) বহুবিয়ের পক্ষে ইনজিল কিতাবের অনেক আয়াত উল্লেখের পর লিখেছেন, 'এসব আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, বহুবিয়ে যে শুধু পছন্দনীয় তা নয়; বরং আল্লাহ তাতে অনেক বরকতও দিয়েছেন।' এমনিভাবে পাদরি ফিকস, জন মিলটন, আইজ্যাক টেলরসহ অনেকেই বহুবিয়ের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন।[৫৬]

---

[৫৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৯৩১।

[৫৬] জন ডেবিন পোর্ট রচিত *লাইফ* : ৫০।

তবে লক্ষণীয় যে, ইসলামপূর্ব যুগে বহুবিয়ের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না; ফলে একজন পুরুষের অধীনে হাজার হাজার মহিলা থাকত।[৫৭] এ ছাড়া খ্রিষ্টান পাদরিরা সাধারণত বহুবিয়েতে অভ্যস্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানিতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনস্টান্টিনোপল সম্রাট ও তার উত্তরাধিকারীদের সবারই অসংখ্য স্ত্রী ছিল। তেমনিভাবে হিন্দুদের বেদগ্রন্থের শিক্ষায়ও বহুবিয়ের বিষয়টি বৈধ ছিল। বেদের শিক্ষানুযায়ী একই সময়ে ১০ জন, ১৩ জন, ২৭ জন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে।[৫৮]

মোটকথা, ইসলামপূর্ব যুগে একাধিক বিয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তবে সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ইতিহাস পড়ে জানা যায়, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসিক কোনো ধর্ম বা আইনে বহুবিয়ের কোনো সীমা নির্ধারিত ছিল না। এমনকি ইসলামের শুরু-যুগেও বহুবিয়ের এ প্রথা নির্ধারিত কোনো সংখ্যার ওপর স্থির ছিল না, ফলে অনেক সাহাবির অধীনে তখন চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। তবে খাদিজা রা.-এর ইনতিকালের পর ইসলামের বিশেষ প্রয়োজনে নবিজির বিয়েবন্ধনে একসঙ্গে ১০ জন পর্যন্ত স্ত্রী ছিলেন।

এরপর যখন দেখা গেল, বহুবিয়ের ফলে মহিলাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। মানুষ প্রথমে লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক বিয়ে করে ফেলত। এরপর তাদের সবার চাহিদা ও অধিকার ঠিকমতো পূরণ করতে পারত না। এসব বিষয় লক্ষ করেই পবিত্র কুরআনের চিরন্তন বিধান, যা পৃথিবী থেকে সর্বপ্রকার জুলুম-অত্যাচার উচ্ছেদের জন্যই নাজিল হয়েছে—মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে বহুবিয়েকে একেবারে নিষেধ করেনি ঠিক; তবে একে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে বহুবিয়ের ফলে যেসব ক্ষতি পরিলক্ষিত হতো, সেসবও দূর করে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এল যে, 'এখন থেকে তোমরা শুধু চারজন নারীকে একই সময়ে বিয়ে করতে পারবে। আর তা-ও এই শর্তে যে, যদি তোমরা চারজন স্ত্রীর অধিকার সমানভাবে আদায় করতে সক্ষম হও। আর যদি এর (তথা সুবিচার ও সমতাবিধানের) সাহস ও ক্ষমতা না থাকে, তাহলে একের অধিক স্ত্রী রাখা অন্যায় ও জুলুম।'

এ ঘোষণার মাধ্যমে একই সময় চারের অধিক স্ত্রী রাখা উম্মতের সর্বসম্মত মতানুযায়ী

---

[৫৭] বর্তমান বাইবেল পড়ে জানা যায়, সুলায়মান আ.-এর ৭০০ জন স্ত্রী এবং ৩০০ জন দাসী ছিলেন। (প্রথম সালাতিন : ৩/১১)। এ ছাড়া দাউদ আ.-এর ৯৯ জন স্ত্রী, ইবরাহিম আ.-এর তিনজন, ইয়াকুব ও মুসা আ.-এর চারজন করে স্ত্রী ছিলেন। (বাইবেল, জন্ম অধ্যায় : ২৯-৩০)

[৫৮] হিন্দু ও আর্যসমাজের স্বীকৃত ধর্মগুরু মনু *ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থে* লিখেছেন, 'কারও যদি চার-পাঁচজন স্ত্রী থাকে এবং তাদের একজন সন্তানের মা হয়, তাহলে অন্যদেরও সন্তানের মা গণ্য করা হবে। (মনু অধ্যায়-৯, শ্লোক-১৮৩; *রিসালায়ে তাআদ্দুদে আজওয়াজ*, অমৃতসর।) এ ছাড়া হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত অবতার হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণ, তার হাজার হাজার স্ত্রী ছিল।

হারাম হয়ে গেছে। তখন যে-সকল সাহাবির অধীনে চারজনের অধিক স্ত্রী ছিলেন, তাঁরা নবিজির নির্দেশে চারজন রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দেন।

গায়লান রা. যখন মুসলমান হন, তখন তাঁর ১০ জন স্ত্রী ছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন, চারজন রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দাও। অনুরূপভাবে নাওফাল ইবনু মুআবিয়া রা. যখন ইসলামগ্রহণ করেন, তখন তাঁর পাঁচজন স্ত্রী ছিলেন। রাসুল তাঁকেও চারজন রেখে একজনকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৫৯]

এই সাধারণ নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী নবিজির পূতপবিত্র স্ত্রীর সংখ্যাও চারের অধিক না হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এখানে এটাও স্পষ্ট যে, উম্মাহাতুল মুমিনিন বা নবিপত্নীগণ অন্যান্য নারীর মতো নন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে,

﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾

হে নবিপত্নীরা, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [সুরা আহজাব : ৩২]

নবিজির পূতপবিত্র স্ত্রীগণ হলেন উম্মতের মা। তাই নবিজির পর তাঁরা অন্য কারও সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন না। এখন যদি সাধারণ নিয়মানুযায়ী চারজনের অতিরিক্ত স্ত্রীদের তালাক দিয়ে পৃথক করে দেওয়া হতো, তাহলে তাঁদের ওপর কতই-না অবিচার করা হতো। সারাটি জীবন তাঁদের নিঃসঙ্গ হয়ে কাটাতে হতো। রাহমাতুল্লিল আলামিনের সঙ্গে কিছুদিনের সহাবস্থান তাঁদের জন্য এক বিরাট কষ্টে পরিণত হতো। একদিকে তাঁরা নবিজির সাহচর্য থেকে মাহরুম হয়ে যেতেন, অপরদিকে অন্য কোথাও এই দুঃখ মোচনের অনুমতিও তাঁদের থাকত না।

এ জন্য তাঁদেরকে সাধারণ এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা কোনোভাবেই সংগত ছিল না। বিশেষ করে সে-সকল নারী, যাঁদের বিয়ে শুধু এ কারণেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, তাঁদের স্বামীরা জিহাদের ময়দানে শহিদ হওয়ায় তাঁরা সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই নবিজি তাঁদের বিয়ে করেছিলেন। এখন যদি তাঁদের তালাক দিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে তাঁদের অবস্থাটা কী দাঁড়াত? এটা কি কোনো উত্তম সহমর্মিতা হতো যে, এখন তাঁরা গোটা জীবনের জন্য বিয়েবঞ্চিত হয়ে গেলেন?

এসব কারণে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী চারের অধিক স্ত্রী রাখা শুধু নবিজির বিশেষত্ব গণ্য হয়। এ ছাড়া নবিজির ঘরোয়া জীবনের অবস্থাসমূহ, যা উম্মতের জন্য দীনি ও দুনিয়াবি সর্বক্ষেত্রে বিধিবন্ধ আদর্শ হিসেবে গণ্য, তা শুধু তাঁর স্ত্রীগণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত। আর এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে, নয়জন

---

[৫৯] *তাফসিরুল কাবির : ৩/১৩৭।*

নারীও সে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এসব বাস্তব অবস্থা সমানে রেখে কেউ কি এ কথা বলতে পারে যে, নবিজির এ বিশেষত্ব (আল্লাহ ক্ষমা করুন) জৈবিক কোনো লালসার কারণে ছিল?

এর পাশাপাশি এ বিষয়টিও লক্ষণীয়, যে সময়ে সমগ্র আরব-অনারব নবিজির বিরোধিতার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তাঁর ওপর নানা অপবাদ আরোপ করছিল; এককথায়, এই দেদীপ্যমান সূর্যের গায়ে কাঁদা নিক্ষেপের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। এসব কিছুই তারা করল কিন্তু কোনো কাফিরও কি কখনো তাঁর সম্পর্কে জৈবিক চাহিদা বা নারীঘটিত ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করেছে? অবশ্যই না। এ ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপের সামান্যতম সুযোগও তারা পায়নি। নতুবা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির দুর্নাম রটাতে এর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কী হতে পারত! যদি সামান্য অবকাশ থাকত, তাহলে আরবের কাফিররা—যাদের কাছে নবিজির ঘরের কোনো খবরও গোপন ছিল না—তিলকে তাল বানিয়ে এটাকে তাঁর দোষ হিসেবে গণ্য করত। কিন্তু তারা এতটা বোকা ছিল না যে, বাস্তবতা অস্বীকার করে নিজের কথার ওজন কমাবে।

আল্লাহভীরুতার মূর্তপ্রতীক নবিজির পবিত্র জীবন সর্বসাধারণের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, তাঁর যৌবনের বড় অংশই একাকিত্ব ও নির্জনতায় কেটেছে। এরপর তাঁর বয়স যখন ২৫, তখন খাদিজার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে—যিনি বিধবা ও সন্তানবতী ছিলেন এবং জীবনের দীর্ঘ ৪০টি বছর অতিক্রম করে তখন বার্ধক্যের দুয়ারে পা রেখেছেন। নবিজির সঙ্গে বিয়ের আগে তিনি আরও দুজন স্বামীর সংসার করেছিলেন এবং দুই পুত্র ও তিন মেয়ের জননী ছিলেন।[৬০] নবিজির পক্ষ থেকে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। তাঁর সঙ্গেই নবিজি ﷺ তাঁর যৌবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন; আর জীবনের বৃহদাংশ তাঁর সঙ্গে কাটানোর ফলে নবিজির সকল সন্তানই তাঁর গর্ভে জন্মান।

অবশ্য খাদিজার ইনতিকালের পর নবিজির বয়স পঞ্চাশের কোটা পেরোলে তিনি আরও কয়েকটি বিয়ে করেন এবং শরয়ি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ১০ জন পর্যন্ত মহিলা তাঁর বিয়েতে আবদ্ধ হন। আয়েশা রা. ছাড়া যাঁদের সবাই বিধবা এবং কেউ কেউ সন্তানবতীও ছিলেন।

এসব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে আমি এটা ধারণাও করতে পারি না যে, কোনো সুস্থ বিবেকের মানুষ নবিজির এই বহুবিয়েকে (নাউজুবিল্লাহ) জৈবিক ভোগ-লালসার পরিণতি বলে মন্তব্য করতে পারে! বাঁকা চোখবিশিষ্ট কেউ যদি নবুওয়াতের

---

[৬০] *সিরাতে মুগলতাই* : ১২।

জ্যোতি ও মাহাত্ম্য দেখতে না পায় এবং তাঁর চরিত্র, কাজ, আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা, দুনিয়াবিমুখতা, সাধনা এবং জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় থেকেও চোখ বন্ধ করে রাখে, তবু এই বহুবিয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাপ্রবাহই তাকে এ কথা বলতে বাধ্য করবে যে, এসব বিয়ে নিশ্চয় জৈবিক কোনো চাহিদার কারণে ছিল না। যদি এমন হতো, তাহলে সারাটা জীবন একজন বৃদ্ধার সঙ্গে অতিবাহিত করে প্রায় ৫৫ বছর বয়সকে এ কাজের জন্য মনোনীত করা কোনো মানুষের বিবেক মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে যখন আরব ও কুরাইশের নেতারা নবিজির একটিমাত্র ইশারায় নিজেদের নির্বাচিত রূপসি ও সুন্দরী মেয়েকে তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। সিরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

এ ছাড়া মুসলিমদের সংখ্যাও তখন লাখের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক মহিলাই নবিজির সঙ্গী হয়ে উভয় জগতের সফলতা ও কল্যাণ লাভ করতে চাইতেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনের ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত শুধু খাদিজার সঙ্গেই কাটিয়ে দেন; অথচ বিয়ের সময়ই খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদিজার ইনতিকালের পর তিনি যে-সকল নারীকে বিয়ে করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা এবং সন্তানের জননী। উম্মতের অসংখ্য কুমারী মেয়ে থাকা সত্ত্বেও নবিজি তাঁদের বিয়ে করেননি।

এই ছোট গ্রন্থে এর চেয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। নাহয় দেখিয়ে দেওয়া যেত যে, নবিজির বহুবিয়ে কতটা ইসলাম ও শরয়ি প্রয়োজনে ছিল। বস্তুত যদি নবি-সহধর্মিনীগণ না হতেন, তাহলে সেসব বিধান—যা শুধু নারীদের মাধ্যমেই উম্মতের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল—অজানাই থেকে যেত।[৬১] কাজেই নবিজির বহুবিয়েকে জৈবিক লালসা আখ্যা দেওয়া নিতান্ত নির্লজ্জতা ও সত্যবিরুদ্ধ বিষয়। অন্যায়প্রীতি যদি বিবেকবুদ্ধিকে লোপ করে না দেয়, তাহলে কোনো কাফিরও এমনটি বলতে পারে না।

নবিজি ﷺ নয়জন পূতপবিত্র স্ত্রী রেখে ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের পর প্রথমে জায়নাব বিনতু জাহাশ এবং সব শেষে উম্মু সালামা রা. ইনতিকাল করেন।

ছয়. নবিজির চাচা ও ফুফু

নবিজির দাদা আবদুল মুত্তালিবের ১০ জন পুত্রসন্তান ছিলেন :

১. হারিস[৬২], ২. জুবায়ের, ৩. হুজাল, ৪. জিরার, ৫. মুকাওয়িম, ৬. আবু লাহাব, ৭.

---

[৬১] আলহামদুলিল্লাহ, হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রাহ. এ প্রয়োজনীয়তা এভাবে পূর্ণ করেছেন যে, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে পূতপবিত্র স্ত্রীগণের মাধ্যমে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা একটি সংকলনে একত্রিত করেছেন। সেই সংকলনের নাম রেখেছেন *তা'দাদুল আজওয়াজ লিসাহিবিল মিরাজ।*

[৬২] তাঁর নামেই আবদুল মুত্তালিবের উপনাম আবুল হারিস প্রসিদ্ধি পেয়েছিল।

আব্বাস রা., ৮. হামজা রা., ৯. আবু তালিব, ১০. আবদুল্লাহ।

তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ হচ্ছেন নবিজির সম্মানিত পিতা; আর বাকি নয়জন হলেন তাঁর চাচা। চাচাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন আব্বাস রা.।

নবিজির ফুফু ছিলেন ছয়জন :

১. উমায়মা, ২. উম্মু হাকিম, ৩. বাররা, ৪. আতিকা, ৫. সাফিয়া, ৬. আরওয়া।

সাত. নবিজির পাহারাদার

বিভিন্ন সময় যাঁরা নবিজির পাহারাদার ছিলেন :

সাআদ ইবনু মুআজ রা. বদরযুদ্ধে, জাকওয়ান ইবনু আবদি কায়েস ও মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা আনসারি রা. উহুদযুদ্ধে, জুবায়ের রা. খন্দকযুদ্ধে, আব্বাদ ইবনু বিশর, সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আবু আইয়ুব আনসারি ও বিলাল রা. ওয়াদিয়ে কুরায়। এরপর যখন এ আয়াত নাজিল হলো—'আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।' [সুরা মায়িদা : ৬৭] তখন নবিজি ﷺ তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে পাহারাদারি উঠিয়ে দেন।

আট. কাবা নির্মাণ ও কুরাইশ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নবিজিকে 'আল আমিন' স্বীকৃতি

নবিজির বয়স যখন ৩৫, তখন মক্কার কুরাইশরা কাবাঘর নতুন করে নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়।[৬৩] সবাই তখন পবিত্র বায়তুল্লাহ শরিফ পুনর্নির্মাণকাজে অংশ নেওয়াকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করত। কুরাইশের প্রতিটি শাখাগোত্র এর নির্মাণকাজে অংশ নিয়ে নিজেদের সৌভাগ্যের সিতারাকে আরও উজ্জ্বল করতে চাচ্ছিল। ফলে কাবার নির্মাণকাজ গোত্রগুলোর মধ্যে ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ তৈরি না হয়।

এভাবে বণ্টনের মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর বসানোর স্থান পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়। এবার হাজরে আসওয়াদ বসানোর পালা; কিন্তু এটা নির্দিষ্ট স্থানে কে বসাবে, এ নিয়ে তুমুল মতবিরোধ তৈরি হয়। প্রত্যেক গোত্র ও ব্যক্তির একান্ত চাওয়া ছিল, সে এই সৌভাগ্য অর্জন করবে। এমনকি তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ এতটাই তুঙ্গে ওঠে যে, একে অপরকে যুদ্ধের আহ্বান করতে থাকে। পরিস্থিতির নাজুকতা দেখে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত

[৬৩] এর আগে শিস ও ইবরাহিম আ. পবিত্র কাবাঘর মেরামত করেন।

হতে মসজিদে সমবেত হন। আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামীকাল ভোরে মসজিদের এ দরজা দিয়ে যিনি প্রথমে প্রবেশ করবেন, তিনিই তোমাদের এই বিরোধ মীমাংসা করে দেবেন। তার দেওয়া সিদ্ধান্তকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে সবাই মাথা পেতে মেনে নেবে। আল্লাহর কী অপার মহিমা! পরদিন ভোরে দেখা গেল, মসজিদের সেই দরজা দিয়ে যিনি প্রথমে প্রবেশ করেছেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ﷺ।

তাঁকে দেখামাত্রই সবাই একবাক্যে বলে ওঠে, 'তিনি তো আমাদের আল আমিন, আমরা তাঁর দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি।' নবিজি ﷺ তখন বিচক্ষণতাপূর্ণ এমন ফায়সালা দেন যে, সবাই তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

নবিজি তখন একটি চাদর বিছিয়ে তাতে হাজরে আসওয়াদ পাথরটি রেখে নির্দেশ দেন, প্রত্যেক গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চাদরের এক-একটি কোণ ধরে নিয়ে আসুন। ফলে তা-ই করা হয়। এরপর নবিজি নিজ হাতে পাথরটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দেন। ইবনু হিশাম রাহ. এ ঘটনা বর্ণনার পর লেখেন, 'নবুওয়াতের আগে কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আল আমিন বা বিশ্বাসী বলে সম্বোধন করত।'[৬৪]

[৬৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/১০৫।*

তৃতীয় অধ্যায়

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কিজীবন

এক. নবুওয়াতপ্রাপ্তি

নবিজির বয়স যখন ৪০ বছর ১ দিন পূর্ণ হয়, তখন প্রকাশ্যভাবে[৬৫] আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতের মহান মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির তারিখ জন্মতারিখের মতোই রবিউল আউয়ালের সোমবার ছিল।[৬৬]

দুই. কুরআন নাজিলের সূচনা

রাসুল ﷺ প্রতিবছর এক মাস হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এ ধারাবাহিকতায় তিনি যে বছর নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, সে বছর রমজানের একরাতে হেরায় আল্লাহর নির্দেশে জিবরিল আ. তাঁর কাছে আসেন। তখন জিবরিল তাঁকে সুরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত শিক্ষা দেন[৬৭] এবং এখান থেকেই তাঁর ওপর ওহি নাজিলের ধারা শুরু হয়।

---

[৬৫] কেননা, অপ্রকাশ্যভাবে তো নবিজিকে সকল নবির আগে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল। *খাসায়িসুল কুবরা।*

[৬৬] *সিরাতে মুগলতাই* : ১৪।

[৬৭] নবিজি বলেন, 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরিল একটুকরো রেশমি কাপড় নিয়ে এসে আমাকে বললেন, "পড়ুন"! আমি বললাম "আমি পড়তে পারি না।" তখন তিনি আমাকে এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি ভাবলাম, মরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন!" আমি বললাম, "আমি পড়তে পারি না।" তিনি পুনরায় আমাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও চাপের প্রচণ্ডতায় আমার মৃত্যুর ভয় হলো। আবার তিনি ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "পড়ুন"! আমি বললাম, "কী পড়ব?" তিনি বললেন, "ইকরা বিসমি রাব্বিকা...।"

নবিজি বলেন, 'এরপর আমি শোনানো আয়াত কয়টি পড়ি। এই পর্যন্ত পড়িয়েই জিবরিল থামলেন এবং চলে গেলেন। এরপর আমি ঘুম থেকে ওঠি। মনে হলো যেন আমি আমার মানসপটে কিছু লিখে নিয়েছি। পরে আমি হেরা গুহা থেকে বেরিয়ে আসি। পর্বতের মধ্যবর্তী এক স্থানে পৌঁছে হঠাৎ ওপর থেকে আওয়াজ শুনতে পাই, "হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আমি জিবরিল।" আমি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখি, জিবরিল একজন মানুষের আকৃতিতে আকাশের দূরদিগন্তে ডানা দুটি ছড়িয়ে রেখেছেন এবং বলছেন, "হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আমি জিবরিল।"'—*সিরাতু ইবনি হিশাম।*

তিন. পৃথিবীতে ইসলামপ্রচার

১. প্রথম পর্যায় : গোপনে ইসলাম প্রচার

রাসুল ﷺ-এর ওপর যখন প্রথম ওহি নাজিল হয়, তখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন না। তখন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান নাজিল হতো।[৬৮]

তখন কিছুদিন ওহি নাজিলের ধারা বন্ধ থাকে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন ওহি নাজিল শুরু হয়, তখন তাতে রাসুল ﷺ-কে ইসলাম প্রচার করতে আদেশ করা হয়; কিন্তু তখন পুরো পৃথিবী ছিল অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। বিশেষত আরবদের অহংকার এবং পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণ তাদেরকে সত্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

এ জন্য আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি ছিল যে, রাসুলকে প্রথমেই প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে না দেওয়া। নাহয় শুরুতেই মানুষ ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। সুতরাং রাসুল ﷺ প্রথমে তাঁর একান্ত পরিচিতজন এবং যাঁদের প্রতি আস্থা ছিল অথবা নিজ দূরদর্শিতায় যাঁদের মধ্যে কল্যাণের নিদর্শন দেখতে পেতেন, শুধু তাঁদেরই দাওয়াত দিতে থাকেন। দাওয়াতের এ পন্থায় প্রথমে তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রী খাদিজা, আবু বকর., চাচাতো ভাই আলি ও পালকপুত্র জায়েদ ইবনু হারিসা রা. ইসলামগ্রহণ করেন।

আবু বকর রা. ইসলামগ্রহণের আগে থেকেই নবিজির বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং সচ্চরিত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ফলে রাসুল ﷺ যখন তাঁকে তাঁর রিসালাত তথা নবি হওয়ার সুসংবাদ দেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

আবু বকর তাঁর গোত্রের সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সব বিষয়ে লোকেরা তাঁর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখত। ইসলামগ্রহণের পর তিনিও সে-সকল লোকের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, যাঁদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেতেন। তাঁর দাওয়াতের ফলেই উসমান ইবনু আফফান, আবদুর রাহমান ইবনু আউফ, সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, জুবায়ের ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ রা. প্রমুখ সাড়া দেন। আবু বকর রা. তখন তাঁদের নিয়ে নবিজির খিদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁরা সবাই ইসলামগ্রহণ করেন।

তাঁদের পর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবায়দুল্লাহ ইবনু হারিস, সায়িদ ইবনু জায়েদ আদাবি, আবু সালামা মাখজুমি, খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস, উসমান ইবনু মাজউন এবং তাঁর দুই ভাই কুদামা ইবনু মাজউন ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মাজউন, আরকাম ইবনু

---

[৬৮] *দুরুসুস সিরাতিল মুহাম্মাদিয়া* : ৬।

আরকাম রা. প্রমুখ সাহাবি ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। তাঁরা সবাই কুরাইশি ছিলেন। কুরাইশের বাইরে থেকে সুহাইব রুমি, আম্মার ইবনু ইয়াসির, আবু জার গিফারি ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. ইসলামগ্রহণ করেন।

তখন পর্যন্ত গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত চলছিল। ইবাদত-বন্দেগিসহ অন্য সব বিধান গোপনেই পালন করা হতো। এমনকি পিতা পুত্র থেকে, পুত্র পিতা থেকে লুকিয়ে নামাজ আদায় করতেন। এভাবে মুসলিমদের সংখ্যা যখন ৩০ জনের বেশি হয়ে যায়, তখন রাসুল ﷺ তাঁদের জন্য একটি বড় ঘর নির্ধারণ করে দেন। তাঁরা সবাই সেই ঘরে জমায়েত হতেন এবং রাসুল ﷺ তাঁদের দীন শিক্ষা দিতেন।

এ পদ্ধতিতে তিন বছর ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তখন কুরাইশের অনেকেই ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকেই তখন মুসলমান হন। একপর্যায়ে এ সংবাদ পুরো মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতে থাকে। এভাবে ক্রমেই ইসলামের সত্যবাণী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রকাশ্যে ইসলামপ্রচারের ঘোষণা দেওয়ার সময় চলে আসে।

২. দ্বিতীয় পর্যায় : প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

তিন বছর পর বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ যখন ইসলামে প্রবেশ করতে থাকেন এবং মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে, তখন প্রকাশ্যে মানুষের কাছে এর দাওয়াত পৌঁছে দিতে নবিজি আদিষ্ট হন।[৬৯] তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আদেশ পালন করেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকেন। কুরাইশের সব গোত্রের লোকজন জড়ো হলে নবিজি তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যদি তোমাদের কাছে এ সংবাদ দিই যে, এক বিরাট লুণ্ঠনকারীবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে এবং শীঘ্রই তোমাদের সব ধনসম্পদ তারা লুট করে নিয়ে যাবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?' উপস্থিত সবাই তখন একবাক্যে বলে ওঠে, 'নিঃসন্দেহে আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করব। কেননা, আজ পর্যন্ত কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।' নবিজি তখন বলেন, 'আমি তোমাদের এই সংবাদ দিচ্ছি যে, তোমরা যদি তোমাদের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহর কঠিন আজাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার জানামতে, পৃথিবীতে কোনো মানুষ তার সম্প্রদায়ের জন্য এমন উত্তম কোনো উপহার নিয়ে আসতে পারেনি, যা আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে, আমি তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের অবারিত কল্যাণ নিয়ে

[৬৯] পবিত্র কুরআনের আয়াত فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ এর মর্মার্থ এটাই।

এসেছি। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন এই দীনের প্রতি তোমাদের আহ্বান করি। আল্লাহর শপথ, আমি যদি পুরো দুনিয়াবাসীর সঙ্গে মিথ্যা বলতাম, তবু তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলতাম না। আমি যদি পৃথিবীর সবাইকে ধোঁকা দিতাম, তবু তোমাদের ধোঁকা দিতাম না। সেই মহান পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি এক, যাঁর কোনো শরিক নেই; আমি বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি এবং সাধারণভাবে দুনিয়াবাসীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি ও রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[৩০]

চার. আরববাসীর বিরোধিতা, শত্রুতা এবং নবিজির দৃঢ়তা

নবিজি ﷺ এভাবেই মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। তবে আরবরা যখন এটা জানতে পারে যে, নবিজির ওপর যে ওহি নাজিল হয়, তাতে তাদের মূর্তিসমূহের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয় এবং যারা এসব মূর্তির পূজা করছে, তাদের মূর্খতা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লেগে যায়। তাদের একটি দল তখন নবিজির চাচা আবু তালিবের কাছে এসে বলে, তিনি যেন তাঁকে এ ধরনের কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখেন; অথবা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করা থেকে তিনি হাত গুটিয়ে নেন। আবু তালিব তখন অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় কৌশলী জবাব দিয়ে তাদের বিদায় দেন। এদিকে নবিজি ﷺ পূর্ণ উদ্যমে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং মানুষকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যান। আরবরা যখন দেখে এভাবে কাজ হচ্ছে না, তখন আবারও তার কাছে গিয়ে শক্ত ভাষায় বলে, 'হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখুন, নাহয় আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব, যে পর্যন্ত-না দু-দলের একদল ধ্বংস হয়ে যায়।'

পাঁচ. আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে নবিজির জবাব

এবার আবু তালিব বেশ চিন্তায় পড়ে যান। তিনি নবিজিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। নবিজি তখন তাঁকে বলেন, 'চাচা, আল্লাহর কসম, আরবের মূর্তিপূজারিরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয় এবং এটা কামনা করে যে, আমি আল্লাহর বাণী তাঁর সৃষ্টির কাছে পৌঁছাব না, তবু আমি আল্লাহর বাণী প্রচার থেকে নিবৃত হব না; যতক্ষণ-না আল্লাহর দীন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে অথবা এ কাজে আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দেবো।'

আবু তালিব নবিজির দৃঢ়তাপূর্ণ এ জবাব শুনে বলেন, 'আচ্ছা ঠিকাছে, তুমি নিজের কাজ চালিয়ে যাও, আমি কখনো তোমার সাহায্য-সহযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নেব না।'

---

[৩০] *দুরুসুস সিরাত* : ১০।

ছয়. মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি ও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

কুরাইশরা যখন দেখল যে, বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিব নবিজির সঙ্গে রয়েছে এবং হজের মৌসুমও একেবারে নিকটবর্তী,[৭১] তখন তারা ভাবনায় পড়ে যায়। তারা ভাবল, মুহাম্মাদ হজের মৌসুমকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং মানুষের মধ্যে তাঁর ধর্মপ্রচারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন। তা ছাড়া তারা এটাও জানত যে, নবিজির সত্যকথায় আকর্ষণ রয়েছে, ফলে মানুষ খুব সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে এবং মুহাম্মাদের দীন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং তারা তখন সবাই একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, মক্কার সব রাস্তায় নিজেদের লোক বসিয়ে রাখতে হবে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ করতে আসা লোকদের এটা জানিয়ে সতর্ক করা হবে যে, 'এখানে একজন জাদুকর রয়েছে, সে তাঁর কথার মাধ্যমে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। তোমরা কেউ তাঁর ধারেকাছেও যাবে না।'

> *আল্লাহর আদেশে জ্বলেছে যে আলো, যে তা নিভিয়ে দিতে চাইবে, তার দাড়িই বরং জ্বলে যাবে।*

আল্লাহর কী অপার মহিমা, তাদের এ কর্মপদ্ধতি নবিজির দাওয়াতের কাজ করে দেয়। যদি তারা এমনটা না করত, তাহলে সম্ভবত এমনও হতে পারত যে, লোকজন তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানত না। কিন্তু তাদের এই কর্মপন্থা হজ করতে আসা লোকদের নবিজি সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করে তোলে।

সাত. কুরাইশদের অত্যাচার ও নবিজির দৃঢ়তা

এভাবে কুরাইশদের সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়; আর বিপরীতে নবিজির দাওয়াতের কাজ আরও বেগবান হয় এবং দলে দলে লোকজন ইসলামে প্রবেশ করে, তখন তারা তাঁর ওপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে। তারা মক্কার কিছু দুষ্টু ছেলেকে জড়ো করে বলে, তারা যেন নবিজির প্রতিটি মজলিসে গিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে এবং যেভাবে পারা যায়, তাঁকে যেন কষ্ট দেয়।

আট. নবিজিকে হত্যাচেষ্টা ও তাঁর প্রকাশ্য মুজিজা

নবিজি ﷺ একবার কাবা শরিফের পাশে নামাজ পড়ছিলেন। তিনি সিজদায় গেলে

[৭১] জাহিলি যুগেও আল্লাহর ঘরের হজের নিয়ম চালু ছিল। মক্কার মুশরিকরাও হজ করত, তবে সেটা তাদের মনগড়া বাতিল পন্থায়।

আবু জাহল এটাকে সুযোগ মনে করে তাঁর মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করতে চাইল। কবি বলেন,

শত্রুর শক্তি দেখে ভয় পেয়ো না, আল্লাহর শক্তি আরও বেশি।

আবু জাহল পাথর হাতে নিয়ে যতই নবিজির নিকটবর্তী হচ্ছিল, ততই তার হাত কাঁপতে লাগল। এমনকি তার হাত থেকে পাথরটি পড়ে যায়। চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন সে প্রাণভয়ে দৌড়ে সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বলতে থাকে, 'আমি যখন মুহাম্মাদের মাথায় পাথরটি ছোড়ার ইচ্ছা করি তখন দেখি, এক আশ্চর্য ধরনের উট আমার দিকে মুখ হা করে এগিয়ে আসছে এবং আমাকে খেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছে! এ ধরনের উট আমি আজ পর্যন্ত কখনো দেখিনি!' এটি এমন ঘটনা, যা কাফিরদের মজলিসে খোদ আবু জাহল স্বীকার করেছিল।

আবু জাহল ছাড়াও উকবা ইবনু আবি মুয়িত, আবু লাহাব, আস ইবনু আবদুল মুত্তালিব, ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা প্রমুখ সবসময় নবিজির পেছনে লেগে থাকত। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার সুযোগ খুঁজত। এদের কারোরই ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি; বরং অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কেউ বদরযুদ্ধে তরবারির কোপে, কেউ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নয়. কুরাইশদের বিভিন্ন প্রলোভন ও নবিজির উত্তর

কুরাইশরা যখন দেখল, তাদের কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসছে না, তখন তারা পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতা উতবা ইবনু রাবিআকে নবিজির কাছে পাঠাবে। সে তাঁকে পার্থিব সব ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব দেবে। এর ফলে হয়তো তিনি তাঁর নতুন এ ধর্মপ্রচারের কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উতবা ইবনু রাবিআ নবিজির কাছে যায়। নবিজি তখন মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। সে তাঁকে বলে, 'ভাতিজা, তুমি বংশমর্যাদায় আমাদের সবার চেয়ে সম্ভ্রান্ত; কিন্তু এরপরও তুমি নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছ, তাদের দেবদেবী ও তাদের সম্পর্কে তুমি নানান বাজে কথা বলছ, তোমার পূর্বপুরুষদের মূর্খ ও বোকা বলছ। আজ তুমি সত্য করেই বলো তো, এসব কর্মকাণ্ড দ্বারা তোমার কী উদ্দেশ্য? এর মাধ্যমে তোমার যদি উদ্দেশ্য হয়, তুমি অনেক ধনসম্পদ সঞ্চয় করবে তাহলে শুনো, আমরা তোমার জন্য এ পরিমাণ সম্পদ জোগাড় করে দেবো যে, তুমি পুরো আরবের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হয়ে যাবে। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তুমি নেতা হবে, তাহলে আমরা সবাই একবাক্যে তোমাকে নেতা মেনে নিতে প্রস্তুত। আমরা

তোমাকে কুরাইশের সব গোত্রের নেতা বানিয়ে দেবো এবং তোমার আদেশ ছাড়া একটি কথাও এদিক-সেদিক হবে না। যদি তোমার উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, তুমি আমাদের বাদশাহ হবে, তাহলে এটাও আমরা মেনে নিতে রাজি আছি। আমরা সম্মিলিতভাবে তোমাকে আমাদের বাদশাহ ঘোষণা করব। যদি (নাউজুবিল্লাহ) তোমার ওপর কোনো দুষ্ট জিনের আসর থাকে; আর ওই দুষ্ট জিনের কথবার্তা (ওহি) মানুষকে শুনিয়ে থাকো এবং তুমি একা তাকে তাড়ানোর ক্ষমতা না রাখো, তাহলে আমরা তোমার জন্য কোনো চিকিৎসক নিয়ে আসব, সে তোমাকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করবে।'[৭২]

দশ. উতবা ইবনু রাবিআর উপলব্ধি

উতবা যখন কথা বলা শেষ করল, তখন নবিজি ﷺ তার সব কথার উত্তরে পবিত্র কুরআনের মাত্র একটি সুরা[৭৩] তিলাওয়াত করে শোনান। উতবা কুরআনের আয়াতগুলো শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। সে তখন ফিরে গিয়ে গোত্রের লোকদের বলতে থাকে, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদের মুখে আমি আজ এমন কিছু কথা শুনেছি, ইতিপূর্বে যা কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, এগুলো কবিতা, গল্প বা গণকদের কোনো মন্ত্র নয়। আমার পরামর্শ হলো, তোমরা তাঁকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, তাঁর যে বাণী আমি শুনেছি, আল্লাহর কসম, অচিরেই তাঁর সুমহান মর্যাদা প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। তোমরা আমার কথা শোনো, আমার কথা মেনে নাও এবং আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো। যদি আরবরা বিজয়ী হতে পারে, তাহলে বিনা কষ্টে তাঁর থেকে রেহাই পেলে; আর সে আরবদের ওপর বিজয়ী হলে তো তাঁর সম্মানে আমরাও সম্মানিত হব। কেননা, সে তো আমাদের গোত্রেরই লোক।'

কুরাইশরা তাদের সবচেয়ে চতুর ও বিচক্ষণ এই নেতার কথায় অবাক হয়ে যায়। তারা তখন এই বলে নিজেদের জান বাঁচায় যে, মুহাম্মাদ নিশ্চয় তাকেও জাদু করে ফেলেছেন![৭৪]

এভাবে কুরাইশদের কোনো কৌশলই যখন কাজে আসেনি, তখন তারা নবিজি, তাঁর সাহাবি ও আত্মীয়স্বজনের ওপর বিভিন্ন নির্যাতন শুরু করে। বিলাল রা.-সহ অনেকের ওপর কঠিন নির্যাতন চালায়। আম্মার ইবনু ইয়াসির রা.-এর মাকে শুধু ইসলামগ্রহণের অপরাধে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহিদ করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটিই শাহাদাতের প্রথম ঘটনা।[৭৫]

---

[৭২] *সিরাতে মুগলতাই* : ২০।
[৭৩] নবিজি ﷺ তখন উতবা ইবনু রাবিআকে সুরা হা-মিম সাজদা থেকে তিলাওয়াত করে শোনান। —*অনুবাদক।*
[৭৪] *দুরুসুস সিরাত* : ১৪।
[৭৫] *সিরাতে মুগলতাই* : ২১।

এগারো. সাহাবিদের হাবশায়[৭৬] হিজরতের নির্দেশ

এতদিন কুরাইশ কাফিররা শুধু নবিজিকে অত্যাচার-নির্যাতন করে আসছিল এবং তিনি সেগুলো নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিলেন। এবার সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতিও এই নির্যাতনের ধারা শুরু হয়। তখন নবিজি হাবশায় তাঁদের হিজরতের নির্দেশ দেন। কেননা, তাঁরা নবিজির মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই সত্যবাণী ও নুরে ইলাহি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কোনোভাবেই রাজি ছিলেন না; বরং তাঁরাও অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সেসব জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

সুতরাং নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজবে ১২ জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হাবশায় হিজরত করেন।[৭৭] তাঁদের মধ্যে উসমান ও তাঁর স্ত্রী নবিকন্যা রুকাইয়া রা.-ও ছিলেন।[৭৮]

হাবশার বাদশাহ নাজাশি[৭৯] মুহাজিরদের অত্যন্ত সম্মান দেখান। তাঁরা সবাই সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। কুরাইশরা যখন এ সংবাদ পায়, তখন তারা আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনু রাবিআকে নাজাশির কাছে এ বলে পাঠায় যে, 'এই লোকগুলো দুষ্কৃতকারী। আপনার রাজ্যে এঁদের অবস্থানের অনুমতি দেবেন না; বরং আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।'

তবে বাদশাহ নাজাশি ভদ্র ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি জবাবে বলেন, 'আমি তাদের ধর্ম ও মতাদর্শ সম্পর্কে তদন্ত করার আগে তাঁদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না।' নাজাশি তখন মুহাজিরদের ডেকে বলেন, 'তোমরা তোমাদের ধর্মমত এবং এর সত্য ঘটনাসমূহ বর্ণনা করো।' তখন জাফর ইবনু আবি তালিব রা.[৮০] সামনে এগিয়ে বলেন,

> বাদশাহ মহান, আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম। মৃত প্রাণী খেতাম। অশ্লীলতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং চরিত্রহীনতায় লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের গ্রাস করত। এই যখন আমাদের অবস্থা ছিল, ঠিক এমন সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে একজন রাসুল পাঠান, তিনি আমাদের বংশেরই সন্তান। আমরা তাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তিনি আমাদের এই আহ্বান জানান যে, আমরা যেন মহান

---

[৭৬] হাবশার পরবর্তী নাম আবিসিনিয়া এবং বর্তমান নাম ইথিওপিয়া।

[৭৭] মুহাজিরগণের সংখ্যার ব্যাপারে আরও মত রয়েছে। *সিরাতে মুগলতাই* : ২১।

[৭৮] *দুরুস সিরাত* : ১৫।

[৭৯] হাবশার বাদশাহদের নাজাশি বলা হতো। *সিরাতে মুগলতাই।*

[৮০] ইউরোপের কোনো কোনো রাজনীতিবিদ; সম্ভবত লর্ড ক্রমার (Lord cromer) বলেছেন, যদি পূর্ব-পশ্চিমের সকল আলিম এক হয়ে ইসলামের হাকিকত বা মৌলিক গুণসমূহ বর্ণনা করতে চান, তবে হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিররা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেভাবে পারবেন না। *দুরুসে তারিখ* : ২১।

আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করি। তাঁর সঙ্গো কাউকে শরিক না করি। মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করি। সত্যকথা বলি। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গো সুসম্পর্ক বজায় রাখি এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গো সদ্ব্যবহার করি। তিনি আমাদেরকে মাহরাম নারীদের সঙ্গো বিয়েশাদি থেকে বারণ করেছেন। হত্যা, লুণ্ঠন, মিথ্যা বলা এবং ইয়াতিমদের সম্পদ খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া আমাদেরকে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এসব কথা শুনে তাঁর প্রতি ইমান এনেছি।

নাজাশি[৮১] এ ভাষণ শুনে খুব মুগ্ধ হন এবং কুরাইশের দূতদের ফিরিয়ে দেন এবং নিজে মুসলমান হয়ে যান।

মুহাজিররা প্রায় তিন মাস সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গো বাস করে মক্কায় ফিরে আসেন। এ সময় উমর রা.-ও নবিজির দুআর বরকতে ইসলামগ্রহণ করেন।[৮২] তখন পর্যন্ত মুসলিমদের সংখ্যা ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারীর চেয়ে বেশি ছিল না। উমরের ইসলামগ্রহণের ফলে মুসলিমদের শক্তি বেড়ে যায়। যাঁরা এতদিন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের কল্যাণে ইসলামের সত্যতাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করা সত্ত্বেও কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের ইসলাম প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তাঁরাও এখন প্রকাশ্যে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করেন। এভাবে আরব গোত্রসমূহে ইসলাম প্রসার ও উন্নতি লাভ করতে থাকে।

যখন কুরাইশরা দেখল যে, নবিজি ও তাঁর সাহাবিদের সম্মান ও মার্যাদা দিন দিন বাড়ছে এবং হাবশার বাদশাহও মুসলিমদের যথেষ্ট সম্মান করছেন, তখন তারা নিজেদের পরিণতি দেখতে শুরু করে।

কুরাইশরা এবার সিদ্ধান্ত নেয়, বনু আবদুল মুত্তালিব ও বনু হাশিমের কাছে এই দাবি করা হবে, তারা তাদের ভাতিজা মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, অন্যথায় আমরা তাদের সঙ্গো সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করব।

কিন্তু বনু আবদুল মুত্তালিব তাদের এই দাবি মেনে নেয়নি। তখন তারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি অঙ্গীকারনামা[৮৩] প্রণয়ন করে, যাতে বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গো সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়তা, বিয়েশাদি এবং বেচাকেনা

[৮১] এই নাজাশি অন্য কোনো ব্যক্তি হবেন, যিনি নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর 'আসহামা' নামক নাজাশি, যাঁর ষষ্ঠ হিজরিতে ইসলামগ্রহণের বিবরণ পরে বর্ণিত হতে যাচ্ছে, তিনি অন্যজন।

[৮২] *দুরুসুত তারিখ আল ইসলামি* : ২২।

[৮৩] এই অঙ্গীকারনামা মানসুর ইবনু ইকরিমা লিখেছিল এবং পরিণতিতে তার হাত অবশ হয়ে যায়। *সিরাতে মুগলতাই* : ২৪।

সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর অঙ্গীকারনামাটি কাবাঘরের অভ্যন্তরে ঝোলানো হয়।

একটি পাহাড়ের উপত্যকায় নবিজি ও তাঁর সকল সাথি-সঙ্গী আর আত্মীয়স্বজনকে বন্দি করে রাখা হয়। তখন আবু লাহাব ছাড়া বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই আবু তালিবের সঙ্গে সেই উপত্যকায় বন্দি ও অবরুদ্ধ ছিলেন। সেখানে আসা-যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। খাদ্যদ্রব্যসহ যেসব পাথেয় সঙ্গে ছিল, তা-ও ফুরিয়ে যায়। একপর্যায়ে তাঁরা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্যন্ত খাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এই পরিস্থিতি দেখে রাসুল ﷺ দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন। এবার মুসলিমদের বড় এক কাফেলা হিজরত করেন, যাঁদের মধ্যে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী ছিলেন।[৮৪] তাঁদের সঙ্গে ইয়ামেনের মুসলিমরাও যোগ দেন, যাঁদের মধ্যে আবু মুসা আশআরি রা. এবং তাঁর গোত্রের লোকজনও ছিলেন।

এদিকে নবিজি ও তাঁর বাকি পরিবার-পরিজন আর সাহাবিরা প্রায় তিন বছর এই জুলুম-অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পার করেন।[৮৫] এরপর কিছু লোক এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে এবং নবিজির ওপর থেকে এই অবরোধ তুলে নিতে উদ্যোগী হয়। অপরদিকে নবিজিকে ওহির মাধ্যমে জানানো হয় যে, কুরাইশদের অঙ্গীকারনামাটি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে এবং তাতে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছু নেই! নবিজি লোকদের এটা জানালে তারা গিয়ে দেখে, নবিজি যেমন বলেছেন, তেমনই রয়েছে। অর্থাৎ, চুক্তিনামাটি উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে এ অবরোধ তুলে দেওয়া হয়।

বারো. তুফায়েল ইবনু আমর দাওসির ইসলামগ্রহণ

তখন তুফায়েল ইবনু আমর দাওসি রা.—যিনি অত্যন্ত ভদ্র ও আপন গোত্রের নেতা ছিলেন—নবিজির খিদমতে উপস্থিত হন এবং ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ও নবিজির চরিত্রমাধুর্য দেখে স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি নবিজিকে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমার গোত্র আমার কথা খুব মান্য করে। আমি ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবো। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমার সঙ্গে এমন কোনো নিদর্শন দেন, যার মাধ্যমে আমি আমার দাবির পক্ষে তাদের বিশ্বাস করাতে পারি।' নবিজি ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলে আল্লাহ তাঁর কপালে এমন একটি নুর চমকিয়ে দেন, যা অন্ধকারে এক উজ্জ্বল প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করত।

---

[৮৪] প্রাগুক্ত : ২৪।

[৮৫] কোনো কোনো বর্ণনায় দুই বছর এবং কোনো কোনো বর্ণনায় কয়েক বছরের কথা বলা হয়েছে। *সিরাতে মুগলতাই* : ২৫।

তুফায়েল ইবনু আমর যখন আপন গোত্রে ফিরে যান, তখন তাঁর মনে হয়, গোত্রের লোকেরা যদি আমার এই নুরকে কোনো বিপদ বা রোগ বলে ধারণা করে বসে এবং বলে যে, ইসলামগ্রহণের কারণে এ রোগ আমাকে আক্রান্ত করেছে! তাই তিনি দুআ করলেন, কপালে থাকা নুরটি যেন তাঁর চিবুকে চলে আসে। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং তাঁর কপালের নুরকে চিবুকে ঝুলন্ত লণ্ঠনের মতো করে দিলেন। এরপর তিনি নিজের গোত্রের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিছুসংখ্যক লোক তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু তাদের সংখ্যা তাঁর ধারণামতো যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি নবিজির খিদমতে গিয়ে নিজের চেষ্টা সফল হতে দুআর আবেদন করলেন। নবিজি আবারও দুআ করলেন এবং বললেন, 'যাও, এবার দীনের প্রচার করো এবং নম্রতা বজায় রেখো।'

তুফায়েল রা. গোত্রের কাছে ফিরে যান এবং পুনরায় লোকদের ইসলাম প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এবার তিনি এমন সফল হন যে, খন্দকযুদ্ধের পর ৭০-৮০টি পরিবারকে মুসলমান বানাতে সক্ষম হন। এরপর খায়বারের যুদ্ধের সময় তাঁদের নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং তাঁরা সবাই জিহাদে অংশ নেন।

তেরো. আবু তালিবের ইনতিকাল

এ সময়ে নবিজি ﷺ-এর চাচা আবু তালিব ইনতিকাল করেন।[৮৬] এই বেদনাদায়ক ঘটনা নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়ালের মাঝামাঝিতে ঘটে। এর তিন দিন পর[৮৭] খাদিজা রা.-ও ইনতিকাল করেন। এ কারণেই নবিজি এ বছরকে 'আমুল হুজন' বা 'শোকের বছর' বলে অভিহিত করেন।[৮৮]

চৌদ্দ. তায়েফে হিজরত

আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবিজির ওপর নির্যাতনের অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে তারা তাঁকে কষ্ট দেওয়া থেকে একটি মুহূর্তও বিরত থাকেনি। যখন মক্কাবাসীর ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন নবিজি সে বছরই অর্থাৎ, নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়ালের শেষ দিকে জায়েদ ইবনুল হারিসাকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফে যান এবং তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সেখানে দীর্ঘ এক মাস তাদের মধ্যে তাবলিগ ও হিদায়াতের কাজে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু একটি

---

[৮৬] প্রাগুক্ত : ২৫।

[৮৭] খাদিজা রা.-এর ইনতিকালের তারিখ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন : ৫ রমজান, হিজরতের পাঁচ বছর আগে, হিজরতের চার বছর আগে এবং মিরাজের পরে ইত্যাদি। *সিরাতে মুগলতাই* : ২৬।

[৮৮] এ বছরই নবিজি ﷺ সাওদা রা.-কে বিয়ে করেন। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনামতে, আয়েশা রা.-এর পরে তাঁকে বিয়ে করেন। *সিরাতে মুগলতাই* : ২৬।

লোকের ভাগ্যেও সত্যগ্রহণের সুযোগ হয়নি। উলটো তারা তাঁকে কষ্ট দিতে শহরের কিছু বখাটে ও লম্পট ছেলেকে লেলিয়ে দেয়। এই হতভাগারা নবিজির পেছনে লেগে যায়। যদি রাহমাতুল্লিল আলামিনের দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিবন্ধক না হতো, তাহলে তাঁর পবিত্র ঠোঁট নড়লেই তদের এসব অপকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে যেত। পরিণতিতে তায়েফ ও তায়েফবাসীদের নামনিশানা পর্যন্ত পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এই হতভাগারা নবিজির ওপর এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করে যে, তাঁর পা রক্তাক্ত হয়ে যায়। জায়েদ ইবনু হারিসা রা. যে দিক থেকেই পাথর আসতে দেখতেন, তিনি সে দিকেই দাঁড়িয়ে নবিজিকে রক্ষা করতেন এবং নিজেই পাথরের আঘাত মাথা পেতে নিতেন। অবশেষে জায়েদ রা.-এর মাথাও আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে যায়। দীর্ঘ এক মাস পর রহমতে আলম নবিজি ﷺ তায়েফ থেকে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করেন যে, তাঁর পা ছিল রক্তে রঞ্জিত; কিন্তু তখনো তাঁর পবিত্র জবান থেকে বদদুআর একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

পনেরো. ইসরা ও মিরাজ[৮৯]

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর[৯০] ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছরই ফখরুল আম্বিয়াকে মর্যাদাপূর্ণ এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান সকল নবি-রাসুলের মধ্যে শুধু নবিজিরই অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, একরাতে[৯১] রাসুল ﷺ কাবার হাতিমে[৯২] শায়িত ছিলেন। এমন সময় জিবরিল ও মিকাইল আ. এসে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে চলুন।' নবিজিকে তখন বুরাক[৯৩] নামক একটি বাহনে চড়ানো হয়। বুরাকের গতি এতই দ্রুত ছিল যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়ত, সেখানেই তার কদম পড়ত। এমন দ্রুতগতির সঙ্গে তাঁকে

---

[৮৯] ইসরা অর্থ রাতে ভ্রমণ করা। মক্কা থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত রাসুল ﷺ-এর বিশেষ ভ্রমণ ইসরা হিসেবে পরিচিত। আর মিরাজ অর্থ, আরোহণের মাধ্যম বা উর্ধ্ব ভ্রমণ। ভূপৃষ্ঠ থেকে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করা। বায়তুল মাকদিস থেকে সাত আসমানের ওপর সিদরাতুল মুনতাহায় গমন এবং সেখান থেকে আবার বায়তুল মাকদিসে ফিরে আসা মিরাজ হিসেবে পরিচিত। মিরাজ হয়েছিল সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়।

[৯০] *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া* গ্রন্থে ইমাম জুহরির বর্ণনায় এমনটি বলা হয়েছে। *নাশরুত তিব।*

[৯১] এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, মিরাজ হিজরতের আগে সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এক বছর আগে, আবার কেউ বলেছেন, কয়েক বছর আগে। অনুরূপ মাস ও তারিখের ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, রবিউল আউয়ালের ১৭ অথবা ২৭ তারিখে হয়েছে। কেউ বলেছেন, রজবের ২৭ তারিখ এবং কেউ অন্য মাস আর অন্য তারিখের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ জন্য মুহাদ্দিসরা বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখের পর কোনো সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারেননি। *ফাতহুল কাদির, আর-রাহিকুল মাখতুম।*

[৯২] *সহিহ বুখারিতে* এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, নবিজি ﷺ তখন নিজের ঘরেই শায়িত ছিলেন।

[৯৩] বুরাক হলো গাধার চেয়ে বড় আর খচ্চরের চেয়ে ছোট কিন্তু দীর্ঘদেহী একটি জন্তু।

প্রথমে শামের আল আকসা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসুলকে তাঁর সম্মানার্থে (বস্তুত এটা মুজিজা ছিল) সমবেত করে রেখেছিলেন। এখানে পৌঁছে জিবরিল আজান দেন এবং সকল নবি-রাসুল কাতারবন্দি হয়ে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু সবাই এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, নামাজের ইমামতি কে করবেন! জিবরিল তখন নবিজির হাত ধরে তাঁকে আগে বাড়িয়ে দেন। এভাবে তিনি সকল নবি-রাসুল ও ফেরেশতার নামাজের ইমামতি করেন।

এ পর্যন্ত ছিল পার্থিব জগতের সফর, যা তিনি বুরাকে চড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে আকাশসমূহে[১৪] ভ্রমণ করানো হয়। প্রথম আকাশে আদমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় আকাশে ইসা ও ইয়াহইয়া, তৃতীয় আকাশে ইউসুফ, চতুর্থ আকাশে ইদরিস, পঞ্চম আকাশে হারুন, ষষ্ঠ আকাশে ইদরিস এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১৫]

এরপর নবিজি সিদরাতুল মুনতাহার দিকে তাশরিফ নেন। পথিমধ্যে হাউজে কাউসার অতিক্রম করেন। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে আল্লাহর সেসব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর নিদর্শন অবলোকন করেন, যা আজ পর্যন্ত কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের চিন্তা ও কল্পনা যে পর্যন্ত যেতে পারেনি। এরপর তাঁর সামনে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়, যা সব ধরনের শাস্তি আর তীব্র লেলিহান আগুনে ভরপুর ছিল, যার সামনে লোহা ও পাথরের মতো কঠিন বস্তুরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

নবিজি ﷺ জাহান্নামে একদল লোককে দেখতে পান যে, তারা মৃত প্রাণী খাচ্ছে। তিনি জানতে চাইলেন, 'এরা কারা?' জিবরিল বললেন 'এরা সে-সকল লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। অর্থাৎ, গিবত বা পরনিন্দা করে বেড়াত।' এরপর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এরপর তিনি আরও সামনে অগ্রসর হন, তবে জিবরিল আ. সেখানেই থেমে যান। কেননা, এখান থেকে সামনে এগোনোর অনুমতি তাঁর ছিল না। এবার তিনি আল্লাহর দর্শন বা দিদার লাভ করেন। সঠিক মতানুযায়ী এই দর্শন কেবল অন্তর দ্বারাই নয়; বরং চোখের দ্বারাও হয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-সহ সকল মুহাক্কিক সাহাবি ও ইমামের অভিমতও এটাই।

সেখানে তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই নামাজ ফরজ হয়।

---

[১৪] এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এই আসমানি সফরও কি বুরাকের মাধ্যমে হয়েছিল, নাকি অন্য কোনো মাধ্যমে। হাফিজ নাজমুদ্দিন গায়তি রাহ. তাঁর *কিসসাতুল মিরাজ* গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন।

[১৫] *সহিহ বুখারি* (*ফাতহুল বারিসহ*) : ১৫/৪৮৫।

এরপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে পুনরায় বুরাকে চড়ে ভোর হওয়ার আগেই মক্কায় ফেরেন।

পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি বাণিজ্যকাফেলার পাশ দিয়ে তিনি অতিক্রম করেন। এদের কোনো কোনো ব্যক্তিকে তিনি সালামও করেন। তারা নবিজির কণ্ঠ চিনতে পারে এবং মক্কায় ফিরে আসার পর এর সাক্ষ্যও দেয়। ভোর হওয়ার আগেই এই বরকতময় সফর শেষ হয়ে যায়।

ষোলো. নবিজির ইসরা সম্পর্কে চাক্ষুষ সাক্ষ্য

সকালে কুরাইশদের মধ্যে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়। কেউ হাততালি দিতে থাকে আবার কেউ অবাক হয়ে মাথায় হাত দেয়; আর কেউ কেউ বিদ্রুপের হাসি হাসতে থাকে। তারপর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবিজিকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। তারা জানতে চায়, 'আচ্ছা বলুন দেখি, বায়তুল মাকদিসের নির্মাণশৈলী ও আকৃতি দেখতে কেমন? পাহাড় থেকে কতটুকু দূরে অবস্থিত?' তাদের প্রশ্নের জবাবে নবিজি বায়তুল মাকদিসের পুরো চিত্র বলে দেন। এভাবে তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে; আর তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে থাকেন। এমনকি একপর্যায়ে তারা এমনসব প্রশ্ন করতে থাকে, একবার দেখার পর যেগুলোর উত্তর কেউ দিতে পারবে না। যেমন : মসজিদে দরজা কতটি, সিঁড়ি কতটি ইত্যাদি ইত্যাদি!

বলাবহুল্য যে, এসব বিষয় কে গণনা করে রাখে? তাই নবিজি খুবই অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু তখনই মুজিজাস্বরূপ মসজিদে আকসাকে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়; আর তিনি গুণে গুণে সবকিছু বলতে থাকেন। তখনই আবু বকর রা. বলে ওঠেন, أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুল।'

এবার কুরাইশরাও নীরব হয়ে যায় এবং বলতে থাকে, মসজিদে আকসার অবস্থা ও বিবরণ তো তিনি ঠিক ঠিকই বর্ণনা করেছেন। তারপর তারা আবু বকরকে বলে, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ এক রাতে মসজিদে আকসায় পৌঁছে পুনরায় ফিরে এসেছেন?' আবু বকর রা. উত্তরে বলেন, 'আমি তো এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, যেখানে সকাল-সন্ধার সামান্য ব্যবধানে আসমানি সংবাদসমূহ তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে এই সামান্য ব্যাপারে কি সংশয় থাকতে পারে?' এ কারণে তাঁর উপাধি 'সিদ্দিক' বা 'বিশ্বাসী' রাখা হয়।

সতেরো. কুরাইশ কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য

এরপর কুরাইশরা পুনরায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবিজিকে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা বলুন তো,

আমাদের অমুক কাফেলা—যারা শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল—তারা এখন কোথায় আছে?' নবিজি বলেন, 'অমুক গোত্রের একটি বাণিজ্যকাফেলাকে আমি 'রাওহা' নামক জায়গায় অতিক্রম করে এসেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে যায় এবং তারা সবাই সেটি খুঁজতে বেরোয়। আমি যখন তাদের হাওদার কাছে যাই, তখন সেখানে কেউ ছিল না। একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল, আমি তা থেকে পানিও পান করি!

এরপর অমুক গোত্রের বাণিজ্যকাফেলাকে আমি অমুক স্থানে অতিক্রম করেছি। যখন বুরাক তাদের নিকটবর্তী হয়, তখন উটগুলো ভয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এদের মধ্যে লাল রঙের যে উটটি সাদা ও কালো রঙের দুটি থলে বহন করে চলছিল, সেটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়!

তারপর অমুক গোত্রের বাণিজ্যকাফেলাকে 'তানইম' নামক স্থানে অতিক্রম করেছি, যার মধ্যে খারি রঙের একটি উট ছিল এবং এর পেটে কালো চট ও কালো দুটি থলে ছিল। এ কাফেলাটি অচিরেই তোমাদের কাছে ফিরে আসবে।' তারা প্রশ্ন করে, 'কবে নাগাদ?' নবিজি বলেন, 'বুধবার পর্যন্ত এসে যাবে!'

ঠিক তেমনই ঘটে, নবিজি যেমন বলেছিলেন এবং সেই কাফেলাগুলোও নবিজির বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে!

যখন কুরাইশদের ওপর মহান আল্লাহর সকল দলিল-প্রমাণ সম্পূর্ণ হয় এবং এই বিস্ময়কার ভ্রমণ সম্পর্কে খোদ তাদের সম্প্রদায়ও সাক্ষ্য দেয়, তখন বিরুদ্ধবাদীদের জন্য নবিজির বরকতময় এই সফরকে নিছক জাদু এবং তাঁকে (মাআজাল্লাহ) জাদুকর আখ্যা দেওয়া ছাড়া অস্বীকারের আর কোনো পথ বাকি থাকেনি। ফলে এটা বলেই তারা মজলিস থেকে উঠে পড়ে।

আঠারো. মদিনায় ইসলাম

একটানা দীর্ঘ ১০টি বছর নবিজি ﷺ আরবের গোত্রসমূহকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোনো মজলিস ও সভা নেই, যেখানে গিয়ে সত্যের দাওয়াত দেননি। হজের মৌসুম, উকাজের মেলা এবং জিলমাজাজ ইত্যাদিতে ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু তারা এর প্রতিউত্তরে তাঁকে সর্বপ্রকার কষ্ট দিতে থাকে এবং ঠাট্টাবিদ্রুপের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা বলত, 'প্রথমে নিজের গোত্রকে মুসলমান বানান, তারপর আমাদের হিদায়াত করতে আসুন।' এভাবে দীর্ঘ সময় চলে যায়। এরপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, ইসলামের প্রচার ও উন্নতি হোক, তখন তিনি মদিনার আউস গোত্রের কতিপয় লোককে নবিজির

খিদমতে পাঠিয়ে দেন, যাঁদের মধ্যে আসআদ ইবনু জুরারা ও জাকওয়ান ইবনু আবদি কায়েস নামের দুজন সে বছরই ইসলামগ্রহণে ধন্য হন।

পরবর্তী বছর আউস গোত্রের আরও কিছু লোক আসেন, যাঁদের ছয় বা আটজন ইসলামগ্রহণ করেন। নবিজি তখন তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি আল্লাহর সত্যবাণী প্রচারে আমাকে সাহায্য করবে?' তাঁরা জবাব দেন, 'আল্লাহর রাসুল, বর্তমানে আমাদের আউস ও খাজরাজের[১৬] মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে। আপনি এখন মদিনায় তাশরিফ নিলে আপনার হাতে বায়আতের ব্যাপারে সবাই একমত হবে না। আপনি আপাতত এক বছরের জন্য এ সিদ্ধান্ত মুলতুবি রাখুন। হতে পারে, আমাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে যাবে এবং আউস ও খাজরাজ উভয় গোত্র মিলে একসঙ্গে ইসলামগ্রহণ করে নেব। আগামী বছর আমরা আবারও আপনার কাছে আসব, তখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।' পরে তাঁরা সবাই মদিনায় ফিরে যান। মদিনায় বনু জুরাইকের মসজিদে প্রথম কুরআন তিলাওয়াত করা হয়।

মূলত আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল যে, মদিনায় ইসলামের প্রসার ঘটুক। ফলে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে মাত্র এক বছরেই অধিকাংশ ঝগড়ার মীমাংসা হয়ে যায় এবং ওয়াদামতো পরের বছর হজের মৌসুমে ১২ জন লোক মক্কায় নবিজির কাছে যান। এর মধ্যে ১০ জন ছিলেন খাজরাজের; আর দুজন আউসের। তাঁদের মধ্য থেকে যারা গত বছর মুসলমান হননি, তাঁরাও এবার মুসলমান হয়ে যান এবং সবাই নবিজির পবিত্র হাতে বায়আত হন। এই বায়আত যেহেতু প্রথমে আকাবা[১৭] নামক স্থানের কাছে হয়েছিল, তাই একে 'বায়আতে আকাবায়ে উলা' বা আকাবার প্রথম বায়আত নামে অভিহিত করা হয়।[১৮]

তাঁরা মুসলমান হয়ে ফিরে যাওয়ার পর মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিটি আসরে-মজলিসে এই একটি কথারই আলোচনা চলতে থাকে।

উনিশ. ইসলামের প্রথম মাদরাসা

মদিনায় পৌঁছে আউস ও খাজরাজের দায়িত্বশীলগণ নবিজির কাছে চিঠি লেখেন,

---

[১৬] তখন মদিনার অধিবাসীরা মুশরিক ও আহলে কিতাব নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মুশরিকরা আবার বিরাট দুটি গোত্রে বিভক্ত ছিল—১. আউস ২. খাজরাজ। গোত্র দুটি সবসময় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং প্রায় ১২০ বছর পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক এই যুদ্ধের ধারা চলে আসছিল। *সিরাতে হালবিয়া* : ১/৪০। এভাবে আহলে কিতাবি বা ইয়াহুদিরাও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—বনু কুরায়জা ও বনু নাজির। এ দুটি গোত্রও পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। *বায়জাবি* টীকাসহ।

[১৭] জামরায়ে আকাবা, যা মিনার প্রথম অংশে অবস্থিত। হজপালনকারীরা এখানেই কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। পরে এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়, যা 'মসজিদে বায়আত' নামে পরিচিত ছিল। *সিরাতে হালবিয়া* : ১/৪২।

[১৮] *সিরাতে হালবিয়া* : ১/৪২।

আল্লাহর মেহেরবানিতে এখানে ইসলামের প্রচার হয়েছে। এখন এমন একজন সাহাবিকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দেবেন, লোকদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবেন, শরিয়তের বিধান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবেন এবং নামাজের সময় ইমামতি করবেন।'

তাঁদের চিঠি পেয়ে নবিজি ﷺ তখন মুসআব ইবনু উমায়ের রা.-কে লোকদের কুরআনের শিক্ষা দিতে মদিনায় পাঠান। এভাবে ইসলামের প্রথম মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয় মদিনায়।[৯৯]

পরের বছর হজের মৌসুমে মদিনা থেকে বিরাট এক কাফেলা মক্কায় আসে। তাঁদের মধ্যে ৭০ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা ছিলেন। নবিজি ﷺ তাঁদের স্বাগত জানান এবং রাতে আকাবার কাছে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মধ্যরাতে সবাই জমায়েত হন। নবিজির সঙ্গে তাঁর চাচা আব্বাস রা.-ও উপস্থিত ছিলেন। তবে তখনো তিনি ইমান আনেননি।

যখন সবাই সমবেত হন, তখন আব্বাস রা. উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 'এ হচ্ছে আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ। সর্বদা আপন গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করে আসছে। আপনারা যাঁরা তাঁকে মদিনায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তাঁরা ভেবে দেখুন, যদি আপনারা তাঁর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে পারেন এবং শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারেন, তবে এ দায়িত্বগ্রহণে এগিয়ে আসুন। অন্যথায় তাঁকে তাঁর নিজের গোত্রেই থাকতে দিন।'

জবাবে মদিনার কাফেলাপ্রধান বলেন, 'নিশ্চয় আমরা এই দায়িত্ব নিচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে কৃত বায়আতের পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কাম্য।' এ কথা শুনে এই অঙ্গীকার ও বায়আতকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আসআদ ইবনু জুরারা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে মদিনাবাসী, একটু অপেক্ষা করো। তোমরা কি বুঝতে পারছ আজ তোমরা কোন বিষয়ে বায়আত করতে যাচ্ছ? বুঝে নাও, এই বায়আত গোটা আরব ও অনারবের বিরোধিতা এবং মোকাবিলার অঙ্গীকার। যদি তোমরা এটাকে পূরণ করতে পারো, তবেই বায়আত সম্পাদন করো। অন্যথায় নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে দাও।' এ কথা শুনে সবাই একবাক্যে বলে ওঠেন, 'আমরা কোনো অবস্থাতেই এ বায়আত থেকে পিছু হটব না।'

এরপর তাঁরা বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহলে আমরা কী প্রতিদান পাব?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত।' এ কথা শুনে সবাই বলে ওঠেন, 'আমরা এতেই সন্তুষ্ট আছি। আপনি আপনার পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিন,

---

[৯৯] প্রাগুক্ত : ১/৪০৩।

আমরা বায়আত করব।' তিনি তখন হাত বাড়ান আর সবাই তাঁর বায়আতলাভে ধন্য হন।

আল্লাহই ভালো জানেন, রাসুল ﷺ-এর শুভদৃষ্টি আর সামান্য কয়েকটি কথা ওই লোকগুলোর ওপর যে কী পরিমাণ প্রভাব ফেলেছিল, মাত্র কিছু সময়ের সাহচর্যের বরকতেই পার্থিব সকল সম্পর্ক এবং সম্মান ও সম্পদের মোহ অন্তর থেকে বেরিয়ে সেখানে শুধু এক আল্লাহর ভালোবাসার রং এতটাই গাঢ় হয়ে ওঠে যে, জানমাল, মানসম্মান সবকিছু এর বিনিময়ে ত্যাগ করতে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে যান। আর এর ছাপ তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এ প্রসঙ্গে এই বায়আতে উপস্থিত উম্মু আম্মারার সন্তান হুবাইবের ঘটনা প্রাসঙ্গিক। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসায়লিমা কাজজাব তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করে; কিন্তু এই অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে বের করাতে পারেনি। এই জালিম তাঁকে জিজ্ঞেস করত, 'তুমি কি এটা সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল?' তিনি বলতেন, 'অবশ্যই।' তখন সে পুনরায় জিজ্ঞেস করত, 'তুমি কি এ কথারও সাক্ষ্য দাও যে, আমিও আল্লাহর রাসুল?' উত্তরে বলতেন, 'কখনো আমি এ সাক্ষ্য দিই না।' তখন সে তাঁর একটি অঙ্গ কেটে ফেলত। এরপর আবারও এভাবে প্রশ্ন করত আর তিনি তার নবুওয়াতের দাবি অস্বীকার করতেন। তখন হতভাগাটি তাঁর আরেকটি অঙ্গ কেটে ফেলত। এভাবে একটি একটি করে তাঁর সমস্ত শরীর টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল।[১০০]

হুবাইব রা. এভাবে শহিদ হয়ে যান; অথচ শরিয়তের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ইসলামের অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি শব্দও মুখ থেকে বের করেননি।

তোমার ভালোবাসা যদিও আমার জীবন করেছে ধ্বংস
শপথ তোমার চরণের, আমি করব না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।

এই বায়আতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা। বায়আতটির নাম 'বায়আতে আকাবায়ে সানিয়া' বা আকাবার দ্বিতীয় বায়আত। এরপর নবিজি ﷺ তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে পুরো কাফেলার দায়িত্বশীল বানিয়ে দেন।[১০১]

[১০০] *সিরাতে হালবিয়া* : ১/৪০৯।
[১০১] প্রাগুক্ত : ৪১১।

চতুর্থ অধ্যায়

নবিজির মাদানি জীবন

এক. মদিনায় হিজরতের সূচনা

কুরাইশরা এই বায়আত সম্পর্কে জানতে পেরে তাদের ক্রোধের অন্ত রইল না। এ পর্যায়ে তারা মুসলিমদের কষ্ট ও নির্যাতনের কোনো পন্থাই আর বাকি রাখেনি। তখন নবিজি ﷺ সাহাবি মদিনায় হিজরত করতে বলেন। ফলে সাহাবিরা কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে একজন-দুজন করে মক্কা থেকে মদিনায় যেতে থাকেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত মক্কায় নবিজি ﷺ, আবু বকর, আলি রা. এবং কয়েকজন দুর্বল লোক ছাড়া আর কোনো মুসলমানই বাকি থাকেননি। আবু বকরও হিজরতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কিন্তু নবিজি তাঁকে বলেন, 'এখন থেকে যাও, যতক্ষণ-না আল্লাহ আমাকেও হিজরতের অনুমতি দিচ্ছেন।' ফলে তিনি নবিজির হিজরতের নির্দেশ আসার অপেক্ষা করতে থাকেন এবং এ সফরের উদ্দেশ্যে দুটি উটও প্রস্তুত করেন। এর একটি নিজের জন্য এবং অন্যটি নবিজির জন্য।[১০২]

দুই. মদিনায় নবিজির হিজরত

কুরাইশের কাফিররা যখন সামগ্রিক বিষয় জানতে পারে, তখন তারা নবিজির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে 'দারুন নাদওয়ায়'[১০৩] সমবেত হয়। দারুন নাদওয়ার সেই বৈঠকে কেউ কেউ তাঁকে বন্দির পরামর্শ দেয়; আর কেউ দেয় দেশান্তরের পরামর্শ। তবে তাদের ধূর্ত লোকেরা বলে, এগুলোর কোনোটিই করা উচিত হবে না। কেননা, বন্দি করা হলে তাঁর সমর্থক ও সাথিরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নেবে; আর দেশান্তর করা হলে তা হবে আমাদের জন্য একেবারেই ক্ষতিকর। কেননা, এমতাবস্থায় মক্কার

---

[১০২] *সিরাতে মুগলতাই : ৩১।*

[১০৩] 'দারুন নাদওয়া' হচ্ছে কুরাইশদের পরামর্শঘর। এখানে বসেই কুরাইশ কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পরিকল্পনা করত। আব্বাসি খিলাফতকালে ২৮৪ হিজরিতে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণের সময় দারুন নাদওয়াকেও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। —*অনুবাদক।*

আশেপাশের সকল আরব তাঁর উত্তম চরিত্র, মিষ্টি কথা এবং পবিত্র কালামের অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবেন।[১০৪]

তখন হতভাগা আবু জাহল পরামর্শ দেয় যে, তাঁকে হত্যা করা হোক। তবে এ হত্যায় সব গোত্রের একজন করে লোক অংশ নেবে, যাতে বনু আবদি মানাফ (নবিজি ﷺ-এর গোত্র) এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারে। তখন উপস্থিত সবাই তার এ প্রস্তাব পছন্দ করে এবং সব গোত্র থেকে একজন করে যুবককে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়। তাদের বলে দেওয়া হয় যে, অমুক রাতে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন এবং তাঁকে দ্রুত হিজরতের নির্দেশ দেন। যে রাতে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক কাফিরদের হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নবিজির ঘরের চারদিক ঘেরাও করে, ঠিক সে রাতেই নবিজি হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তিনি আলিকে বলেন, তিনি যেন তাঁর খাটে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন, যাতে কাফিররা এটা জানতে না পারে যে, তিনি ঘরে নেই।

এরপর নবিজি যখন ঘর থেকে বের হন, তখন তাঁর দরজায় কাফিরদের যেন মেলা জমে। তিনি সুরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে ঘর থেকে বের হন এবং فَأَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (আমি তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।) এই আয়াত পর্যন্ত যখন পৌঁছান, তখন আয়াতটি কয়েকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের চোখে পর্দা ফেলে দেন। তারা আর নবিজিকে দেখতে পায়নি। এরপর তিনি আবু বকরের বাড়িতে যান। আবু বকর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন এবং একজন পথপ্রদর্শকও প্রস্তুত করে রাখেন।

এভাবে সিদ্দিকে আকবর রা. নবিজির সঙ্গী হন এবং তাঁরা উভয়ে বাড়ির পেছন দিকের ছোট একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাওর[১০৫] পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান।

তিন. সাওর গুহায় অবস্থান

এবার নবিজি ﷺ আবু বকর রা.-কে নিয়ে সাওর পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান নেন। এদিকে কুরাইশ যুবকরা নবিজির ঘরের বাইরে সকাল পর্যন্ত এ অপেক্ষা করে যে, নবিজি কখন ঘর থেকে বেরোবেন। পরে তারা যখন জানতে পারে, নবিজির বিছানায় আলি শুয়ে আছেন, তখন বেশ অবাক হয় এবং চতুর্দিকে নবিজির সন্ধানে নিজেদের গুপ্তচর পাঠায়। কুরাইশরা এ সময় ঘোষণা দেয়, যে নবিজিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে

---

[১০৪] *সিরাতে মুগলতাই।*

[১০৫] সাওর মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়।

পারবে, তাকে উপহার হিসেবে ১০০ উট দেওয়া হবে। এ ঘোষণার পর বহু লোক পুরস্কারের আশায় নবিজিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। এমনকি পদচিহ্নবিষয়ে অভিজ্ঞ কতেক ব্যক্তি নবিজির পায়ের চিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক সেই গুহার একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। সামান্য একটু নুয়ে তাকালেই তারা নবিজিকে পরিষ্কার দেখতে পেত। এ সময় আবু বকর রা. বিচলিত হয়ে পড়েন। নবিজি ﷺ তাঁকে বলেন, 'ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।'

আল্লাহর কী মহিমা! কাফিরদের দৃষ্টি তখন গুহা থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং কেউ এতটুকুও ঝুঁকে তাকায়নি; বরং তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনু খালফ বলে ওঠে, 'এখানে তাঁর থাকাটা অসম্ভব।' কেননা, আল্লাহর নির্দেশে তখন গুহার প্রবেশপথে মাকড়সা রাতারাতি জাল বুনে রেখেছিল এবং বন্য কবুতর[১০৬] কোথা থেকে গুহার ঠিক প্রবেশপথে বাসা তৈরি করে ফেলেছিল!

রাসুল ও আবু বকর এ গুহায় একটানা তিন রাত আত্মগোপন করে থাকেন। একপর্যায়ে অন্বেষণকারীরা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

এই তিন দিনই রাতের অন্ধকারে আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ রা. গোপনে তাঁদের কাছে যেতেন এবং ভোর হওয়ার আগেই আবার মক্কায় ফিরে আসতেন। দিনভর কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে রাতে নবিজির কাছে তা বর্ণনা করতেন। অপরদিকে তাঁর বোন আসমা বিনতু আবু বকর প্রতিরাতে তাঁদের কাছে খাবার পৌঁছে দিতেন। যেহেতু আরবের লোকেরা পদচিহ্ন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখত, তাই পদচিহ্নগুলো যেন মুছে যায়, এই উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ রা তাঁর গোলামকে বলে রেখেছিলেন, সে যেন প্রতিদিন বকরি চরাতে চরাতে গুহা পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেন তাদের পায়ের চিহ্ন মুছে যায়।

চার. সাওর গুহা থেকে মদিনার পথে

সাওর গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪ রবিউল আউয়াল[১০৭] সোমবার আবু বকর রা.-এর আজাদকৃত গোলাম আমির ইবনু ফুহায়রা রা. সেই উট দুটি নিয়ে উপস্থিত হন, যেগুলোকে এই সফরের জন্যই তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিতও গিয়ে উপস্থিত হন, যাঁকে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ দেখাতে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

নবিজি ﷺ এক উটে আর আবু বকর অন্যটিতে আরোহণ করেন। আবু বকর খিদমতের

---

[১০৬] সুহায়িল রা. বলেন, হারাম শরিফে কবুতরের এ ধারা এখান থেকেই শুরু হয়। *সিরাতে মুগলতাই।*

[১০৭] হিজরতের এ ঘটনা নবিজির জন্মের ৫৩ বছর এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তির ১৩ বছর পর সংঘটিত হয়। *সিরাতে মুগলতাই।*

জন্য আমির ইবনু ফুহায়রাকেও নিজের পাশে বসান আর আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত রাস্তা দেখিয়ে দিতে আগে আগে চলেন।[১০৮]

পাঁচ. সুরাকার উপস্থিতি ও তার ঘোড়া মাটিতে ধেবে যাওয়া

নবিজি ﷺ মদিনার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় কুরাইশ কাফিরদের দূত সুরাকা ইবনু মালিক নবিজিকে খুঁজে ফিরছিল। একপর্যায়ে সে নবিজির সন্ধান পেয়ে তাঁর পিছু নেয়। এমনকি তাঁর একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। এভাবে সুরাকা যখন নবিজির একেবারে নাগালে চলে আসে, তখন তার ঘোড়াটি হোঁচট খায়। ফলে সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। পুনরায় ঘোড়ায় চড়ে নবিজির পেছনে ধাওয়া করে এবং এত কাছে চলে আসে যে, নবিজির কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছিল। এ সময় আবু বকর রা. বার বার পেছনে তাকিয়ে তার গতিবিধি লক্ষ করছিলেন; কিন্তু নবিজি ﷺ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। যখন সে একেবারে কাছে এসে পড়ে, তখন মরুভূমির শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে তার ঘোড়ার চারটি পা হাঁটু পর্যন্ত ধেবে যায়। ফলে সুরাকা আবারও ঘোড়া থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ঘোড়াটিকে বের করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে নবিজির কাছে সাহায্য চাইলে নবিজি থেমে যান এবং তাঁর বরকতে ঘোড়াটি মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।[১০৯]

ঘোড়াটির পা জমিন থেকে বের হলে তার পায়ের জায়গা থেকে একধরনের ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এটা দেখে সুরাকা আরও বেশি ভয় পেয়ে যায় এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তার সব পাথেয় নবিজির খিদমতে পেশ করে। নবিজি এসব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'যেহেতু তুমি ইসলাম গ্রহণ করোনি, তাই আমি তোমার কিছু নিতে পারি না। তবে তুমি আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না। ব্যস, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।'

সুরাকা সেখান থেকে ফিরে আসে এবং যে পর্যন্ত নবিজির ক্ষতির আশঙ্কা ছিল, ততক্ষণ সে কারও কাছে এ ঘটনা বলেনি।[১১০]

ছয়. সুরাকার মুখে নবিজির নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি

কিছুদিন যাওয়ার পর সুরাকা ইবনু মালিক[১১১] ঘটনাটি আবু জাহলের কাছে বলেন। তখন

---

[১০৮] *সিরাতে হালবিয়া।*

[১০৯] *সিরাতে মুগলতাই।*

[১১০] *সিরাতে হালবিয়া* : ১/৪৩৬।

[১১১] সুরাকা ইবনু মালিক অষ্টম হিজরিতে মক্কাবিজয়ের সময় মুসলমান হন। রাজিআল্লাহু আনহু।

তিনি কিছু কবিতা-পঙ্‌ক্তিও আবৃত্তি করেন।[১১২] সেই কবিতাসমূহের ভাবার্থ হচ্ছে, 'হে আবুল হিকাম,[১১৩] লাত দেবতার শপথ করে বলছি, তুমি যদি আমার ঘোড়াটির পা হাঁটু পর্যন্ত জমিনে ধেবে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে, তাহলে বুঝতে পারতে এবং এ ব্যাপারে তোমার কোনো সন্দেহ থাকত না যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল। সুতরাং এমন কে আছে, যে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? কাজেই আমার মত হচ্ছে, তোমার জন্য উচিত হবে, তুমি নিজে তাঁর বিরোধিতা থেকে রিবত থাকবে এবং লোকদেরও বিরত রাখবে। কেননা, আমি দেখতে পাচ্ছি, একদিন তাঁর বিজয়ের নিদর্শনসমূহ ফুটে উঠবে। তখন সকল মানুষই এই কামনা করবে যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে নিতাম, তাহলে কতই-না ভালো হতো!'[১১৪]

সাত. নবিজির মুজিজা এবং উম্মু মাবাদ ও তাঁর স্বামীর ইসলামগ্রহণ

মদিনার পথে নবিজি ﷺ উম্মু মাবাদ বিনতু খালিদ নামের এক মহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার যে বকরিগুলো ইতিপূর্বে দুধখরায় ভুগছিল, নবিজি সেগুলোর স্তনে হাত বুলিয়ে দিলে তা দুধে ভরে ওঠে। পরে তা থেকে তিনি নিজেও পান করেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরও পান করান। আর এই বরকত এভাবেই অব্যাহত থাকে। উম্মু মাবাদের বাড়ি থেকে নবিজি চলে যাওয়ার পর তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরে বকরির দুধ-সম্পর্কিত আশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্মিত হন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মু মাবাদ বলেন, 'আজ আমাদের বাড়িতে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত এক যুবক কিছুক্ষণের জন্য মেহমান হয়েছিলেন। এসব তাঁরই পবিত্র হাতের বরকত।' এ কথা শুনে তাঁর স্বামী বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমার তো মনে হচ্ছে তিনি মক্কার সেই মহান পুরুষই হবেন।' এক বর্ণনায় রয়েছে, এরপর এই বেদুইন দম্পতিও হিজরত করে মদিনায় চলে যান এবং ইসলামগ্রহণ করেন।

---

[১১২] কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলো সিরাতে মুগলতাইয়ে ভুল ছিল। *রাওজুল উনফ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬ নং পৃষ্ঠা থেকে শুদ্ধ পঙ্‌ক্তিগুলো নেওয়া হয়েছে। মূল কবিতা হচ্ছে,

أبا حكم والله لو كنت شاهداً • لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه

علمت ولم تشكك بأن محمداً • رسول وبرهان فمن ذا يقاومه؟

عليك فكف القوم عنه فإنني • أرى أمره يوماً ستبدو معالمه

بأمر تود الناس فيه بأسرهم • بأن جميع الناس ظرا مسالمه

[১১৩] আবু জাহল হচ্ছে তার উপাধি। সমগ্র আরবে সে 'আবুল হিকাম' বা মহাজ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণে তাকে 'আবু জাহল' বা মহা মূর্খ উপাধি দেওয়া হয়। এক কবির কবিতায় বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে,

الناس كناه ابا حكم • والله كناه ابا جهل

মানুষ তাকে ডাকত জ্ঞানী আবুল হিকাম বলে
আল্লাহ বলেন, দীনের বিরোধিতার কারণে তুই আবু জাহল হলে।

[১১৪] *সিরাতে মুগলতাই : ৩৫; আল-ইসাবা : ৫/৩৬।*

আট. কুবায় অবতরণ

এখনে থেকে রওনা হয়ে নবিজি ﷺ কুবায়[১১৫] পৌঁছান। আনসাররা যখন থেকে নবিজির আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে প্রতিদিন নিজেদের মহল্লা থেকে বেরিয়ে আসতেন। সেদিনও তাঁরা যথারীতি অপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি আওয়াজ শোনা যায়—'এতদিন তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে, তিনি চলে এসেছেন!'

নবিজিকে আসতে দেখে সবাই বিপুল উদ্দীপনায় সংবর্ধনার সঙ্গে তাঁকে বরণ করেন। কুবায় নবিজি ও তাঁর সাথিরা ১৪ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটিই ইসলামের প্রথম মসজিদ।

নয়. আলির হিজরত ও কুবায় সাক্ষাৎ

নবিজির আমানতদারিতা যেহেতু কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত ছিল, তাই তাঁর কাছে অধিকাংশ মানুষের কিছু-না কিছু আমানত গচ্ছিত থাকত। হিজরতের সময় এ কারণে তিনি আলি রা.-কে মক্কায় রেখে এসেছিলেন যে, তিনি যেন সেই গচ্ছিত আমানতসমূহ নিজ নিজ মালিকের হাতে পৌঁছে দেন। নবিজির নির্দেশমতো আলি সব আমানত তাদের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার পর তিনিও মদিনার উদ্দেশে রওনা করেন এবং কুবায় নবিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দশ. হিজরিবর্ষের সূচনা

এ সময় নবিজির নির্দেশে উমর রা.[১১৬] হিজরিবর্ষ বা ইসলামি সনের সূচনা করেন এবং মুহাররামকে ইসলামি বর্ষপঞ্জিকার প্রথম মাস নির্ধারণ করেন।

এগারো. মদিনায় প্রবেশ

রবিউল আউয়ালের শুক্রবার দিন নবিজি ﷺ কুবা থেকে বিদায় নিয়ে মদিনার দিকে রওনা দেন। মদিনার আনসাররা তখন আনন্দের আতিশয্যে নবিজির বাহন ঘিরে সামনে এগোচ্ছিলেন। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ-বা বাহনে আরোহী হয়ে। সবাই তখন নবিজির উটের লাগাম ধরতে চেষ্টা করেন। তাঁদের সবারই আন্তরিক চাওয়া ছিল, তিনি যেন তাঁর ঘরের মেহমান হন এবং কিছুদিন অবস্থান করেন। মহিলা ও শিশুদের আনন্দ

---

[১১৫] মদিনার অদূরে একটি জায়গার নাম।

[১১৬] আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. তাঁর *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ।*

সে দিন দেখে কে! শিশু-কিশোররা তখন আনন্দে গান গাইছিল।

সে দিন ছিল শুক্রবার। তাই নবিজি ﷺ যখন বনু সালিম ইবনু আউফের মহল্লায় পৌঁছান, তখন জুমুআর সময় হয়ে যায়। ফলে তিনি সেখানেই জুমুআ আদায় করে পুনরায় বাহনে সওয়ার হন।

তখন পথিমধ্যে যে আনসার সাহাবির বাড়ি সামনে পড়ত, তিনিই নবিজির কাছে আবেদন করেন, 'আমার দরিদ্র এ ঘরে তাশরিফ রাখুন।' তিনি তাঁদের বলেন, 'তোমরা উটনীকে তার নিজের মতো করে চলতে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত। তাকে যেখানে থামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সে নিজেই থেমে যাবে।' ফলে সেটি তার মতো করে চলতে লাগল। একপর্যায়ে নবিজির মামার বংশ আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর বাড়ির সামনে গিয়ে উটনীটি বসে পড়ে। সৌভাগ্যের সিতারা হয়ে আবু আইয়ুবের মেহমান হন নবিজি ﷺ এবং বেশ কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে থাকেন।

বারো. মসজিদে নববি নির্মাণ

তখন পর্যন্ত মদিনায় কোনো মসজিদ ছিল না, তাই যেখানে সুযোগ হতো, সেখানেই নামাজ পড়া হতো। নবিজি ﷺ মদিনায় আসার পর উটনীটি প্রথমে যে জায়গায় থেমেছিল, সে জায়গাটি কিনে সেখানেই মসজিদে নববি নির্মাণ করেন।[১১৭]

মসজিদে নববির দেয়াল ছিল প্রথমে কাঁচা ইটের, খুঁটি ছিল খেজুরগাছ আর ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি। মসজিদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিসের দিকে। কেননা, তখন পর্যন্ত মুসলিমদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিস। মসজিদের সঙ্গে দুটি কক্ষও তৈরি করা হয়—একটি আয়েশা আর অন্যটি সাওদা রা.-এর জন্য। এরপর নবিজি ﷺ একজনকে মক্কায় পাঠিয়ে তাঁর পরিবারের লোকদের মদিনায় নিয়ে আসেন। এ সময় আবু বকর রা.-ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে মদিনায় নিয়ে আসেন। ফলে

---

[১১৭] উমর রা. তাঁর খিলাফতকালে মসজিদের জায়গা সম্প্রসারণ করেন, তবে এর নির্মাণকাঠামো আগের মতোই বহাল রাখেন। এরপর উসমান রা. খলিফা হলে তিনি তাতে বেশ পরিবর্তন নিয়ে আসেন। জায়গার পরিধি আরও বাড়ান। মসজিদের দেয়ালগুলোতে নকশাযুক্ত পাথর বসান এবং রুপার প্রলেপ দেন। খুঁটিগুলোতেও নকশাযুক্ত পাথর বসান এবং শালকাঠ দিয়ে ছাদ তৈরি করেন। এরপর ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের শাসনামলে তাঁর নির্দেশে উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ. মসজিদের পরিধি আরও বিস্তৃত করেন। তিনি নবিপত্নীদের কক্ষগুলোও মসজিদের ভেতরে নিয়ে আসেন। এরপর ১৬০ হিজরিতে আব্বাসি খলিফা মাহদি, এরপর ২০২ হিজরিতে খলিফা মামুন মসজিদের অবকাঠামোতে আরও ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। এরপর উসমানি খিলাফতের খলিফারা সেটিকে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম করে নির্মাণ করেন। *সিরাতে মুগলতাই* : ৩৭।

উম্মুল মুমিনিন সাওদা রা. এবং নবিজির দুই মেয়ে ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম রা.-ও মদিনায় চলে আসেন। এ ছাড়া অপর মেয়ে জায়নাব রা.-কে তাঁর স্বামী আবুল আস মদিনায় আসতে দেননি, যেহেতু আবুল আস তখনো মুসলমান হননি। অপরদিকে আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ রা. তাঁর মা ও দুই বোন আয়েশা ও আসমাকে নিয়ে মদিনায় চলে আসেন।

এ পর্যায়ে কতিপয় অক্ষম ও দুর্বল মুসলমান মক্কায় রয়ে যান, যাদের সফর করে মদিনায় আসার মতো শারীরিক শক্তি ছিল না। তবে তাঁদের কেউ কেউ মদিনার উদ্দেশে বের হয়েছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নবিজির যুদ্ধজীবন

গুরুত্বপূর্ণ গাজওয়া ও সারিয়া এবং বিভিন্ন ঘটনা

প্রথম হিজরি

ইসলামে জিহাদের অনুমোদন, সারিয়ায়ে হামজা ও সারিয়ায়ে উবায়দা

এক. ইসলামে জিহাদের অনুমোদন

নবিজির ৫৩ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র পাঠকের সামনে চলে এসেছে এবং এরই মধ্যে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণসহ আমরা জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার-প্রসার কীভাবে হয়েছিল। হিজরতের আগ পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণি ও গোত্রের হাজার হাজার মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রিত হয়ে এমনভাবে আকর্ষিত হন যে, তাঁরা ইসলাম ও ইসলামের নবিকে নিজেদের সহায়-সম্পদ, বাপ-দাদা ও স্ত্রী-সন্তান থেকে বরং নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করতেন। তাঁদের কি রাষ্ট্রীয়ভাবে জোরজবরদস্তি, ধনসম্পদের লোভ, সম্মান-প্রতিপত্তির মোহ কিংবা কোনো সশস্ত্র বাহিনীর তরবারির ভয় ইসলামগ্রহণে বাধ্য করেছিল? নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ ছিল?

কিন্তু যখন নিরক্ষর নবি ﷺ (তাঁর ওপর আমার পিতামাতা কুরবান হোন)-এর পবিত্র জীবনেতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তখন নিশ্চিতভাবে এগুলোর নেতিবাচক উত্তরই পাওয়া যায়। এটা তো একেবারে স্পষ্ট যে, এই ইয়াতিম সন্তান, দুনিয়ায় যাঁর আসার আগেই পিতৃছায়া মাথার ওপর থেকে উঠে গিয়েছিল, যাঁকে শৈশবে (মাত্র ছয় বছর বয়সে) জন্মদাত্রী মায়ের স্নেহমমতা থেকেও বঞ্চিত হতে হয়েছিল, যাঁর ঘরে একটানা কয়েক মাস পর্যন্ত আগুন জ্বালানোর সুযোগ হতো না, যাঁর পরিবার-পরিজন কোনোদিন পেট ভরে খেতে পারতেন না, যাঁর হাতেগোনা জীবিত আত্মীয়স্বজনও

একটিমাত্র সত্যের বাণী উচ্চারণের অপরাধে শুধু যে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে এমন নয়; বরং তাঁর কঠিন শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সেই তিনি কি কারও ওপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লোভ করতে পারেন? অথবা সম্পদের লোভ দেখিয়ে কিংবা তরবারির জোর খাটিয়ে কাউকে স্বীয় মতাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেন?

এ ছাড়া ইতিহাসের বিরাট এক দাস্তান আমাদের সামনে রয়েছে, যাতে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান যে, নবিজির পবিত্র জীবনের ৫৩টি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, প্রথম জীবনের সহায়-সম্বলহীনতা আর অসহায়ত্বের পরে ইসলাম যখন অনেকটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বড় বড় যোদ্ধা ও বিত্তশালী সাহাবি ইসলামে দীক্ষিত হন, ইসলাম তখনো কোনো কাফিরের গায়ে হাত ওঠায়নি; বরং অত্যাচারীদের অত্যাচারের কোনো জবাবও দেয়নি।

অথচ মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে শুধু নবিজি ﷺ নন; বরং তাঁর সকল আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন এবং বন্ধুবান্ধব ও অনুসারীদের ওপর এমন নির্যাতন চালানো হয়েছে, যা বলে বা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সব ধরনের শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী কুরাইশ কাফিররা নবিজিকে নির্যাতন, এমনকি হত্যা করতেও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। যেমন, নবুওয়াতের শুরুর দিকে দীর্ঘ তিন বছর নবিজির অনুসারীসহ সকল আত্মীয়স্বজন অবরুদ্ধ থাকা, তাঁর সঙ্গে কুরাইশের পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং সাহাবিদের প্রতি বিভিন্ন নির্যাতন ইত্যাদি, যা আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন।

এসব কিছু সত্ত্বেও কুরআন তখন তার অনুসারীদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করতে বলেছে; অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। অবশ্য তখন যে জিহাদের নির্দেশ ছিল তা হলো, প্রজ্ঞা ও উপদেশমূলক[১১৮] কথার মাধ্যমে মহান রবের দিকে কাফিরদের ডাকো। এতেও যদি কাজ না হয় এবং পারস্পরিক বিতর্কের উদ্ভব হয়, তাহলে উত্তম কৌশল ও নরম কথার মাধ্যমেই তাদের মোকাবিলা করো। এ ছাড়া কুরআনের দলিলের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পূর্ণ জিহাদ করো,[১১৯] যেন তারা সত্য অনুধাবন করতে পারে।

ওই পর্যন্ত যে হাজারো মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়ে সমূহ নিপীড়নের নিশানায় পরিণত হতে রাজি হয়েছিলেন—বলাবাহুল্য তাঁরা দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা অথবা রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ কিংবা তরবারির জোরে ইসলামগ্রহণে বাধ্য হতে পারেন না। পরিষ্কার এই বাস্তবতা দেখার পরেও কি সে-সকল মানুষ আল্লাহর কাছে লজ্জিত হবে না, যারা ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতার ওপর কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে বলে বেড়ায় যে, ইসলাম

---

১১৮ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ এ আয়াতের মর্মার্থ এটাই।

১১৯ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا এ আয়াতের মর্মার্থ এটাই।

তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা কি এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারবে যে, সে-সকল মানুষের ওপর কে তরবারি চলিয়েছিল, যারা কেবল মুসলমান হয়নি; বরং ইসলামের প্রয়োজনে তরবারি পর্যন্ত ধারণ করতে এবং হাসিমুখে নিজের জীবনও বিপন্ন করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন? তারা কি বলতে পারে যে, আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি রা.-এর ওপর কে তারবারি চালিয়ে তাঁদের মুসলমান বানিয়েছিল? আবু জার ও উনাইস রা. এবং তাঁদের গোত্রের লোকদের কে বাধ্য করেছিল যে, তাঁরা সবাই এসে মুসলমান হয়ে গেলেন? নাজরানের খ্রিস্টানদের কে বাধ্য করেছিল যে, তাঁরা মক্কায় এসে ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন? জামাদ আজদির ওপর কে চাপ সৃষ্টি করেছিল কিংবা তুফায়েল ইবনু আমর দাওসি ও তাঁর গোত্রের ওপর কে তরবারি চালিয়েছিল? বনু আবদুল আশহালের ওপর কে চাপ সৃষ্টি করেছিল? মদিনার আনাসরদের ওপর কে শক্তি প্রয়োগ করেছিল যে, তাঁরা শুধু ইসলামগ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং নবিজিকে নিজেদের কাছে এনে তাঁর সব দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন এবং নিজেদের জানমাল তাঁর জন্য উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন? বুরাইদা আসলামিকে কে বাধ্য করেছিল যে, তিনি ৭০ জনের কাফেলাসহ মদিনার পথে নবিজির খিদমতে গিয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলেন? হাবশার বাদশাহ নাজাশির ওপর কোন তরবারি চলছিল যে, তিনি তাঁর বাদশাহি আর প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও হিজরতের আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন? আবু হিন্দ, তামিম দারি এবং নাইম রা. প্রমুখের ওপর কে শক্তি প্রয়োগ করেছিল যে, তাঁরা সুদূর শাম থেকে সফর করে নবিজির খিদমতে গিয়ে তাঁর গোলামি বরণ করে নিলেন? এ ধরনের শত শত ঘটনা রয়েছে, যেগুলো দ্বারা ইতিহাসের পাতা পূর্ণ হয়ে আছে।[১২০] এগুলো এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতা, যা প্রত্যক্ষ করার পর কেউ এ বিশ্বাস না করে থাকতে পারে না যে, 'ইসলাম তার প্রচার-প্রসারে তরবারির মুখাপেক্ষী নয়।'

দুই. ইসলাম তার প্রচার-প্রসারে তরবারির মুখাপেক্ষী নয়

জিহাদ ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এটা হতে পারে না যে, মানুষের গলায় তরবারি রেখে মুসলমান হতে তাদের বাধ্য করা হবে; অথবা বলপ্রয়োগ করে ইসলামে তাদের প্রবেশ করানো হবে। জিহাদের সঙ্গে সঙ্গে জিজয়ার[১২১] বিধান এবং কাফিরদের জিম্মি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ঠিক মুসলমানের মতোই তাদের জানমালের হিফাজত

---

[১২০] এসব ঘটনা *রিসালায়ে হামিদিয়া* থেকে সংগৃহীত।

[১২১] জিজয়া-কর—মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের থেকে আদায়যোগ্য এক ধরনের নিরাপত্তা 'কর'। এটা নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধদের ওপর আরোপিত হয় না। এটা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের থেকে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময়ে নেওয়া হয়।

ইত্যাদি ইসলামি বিধান নিজেই এর সাক্ষ্য দেয় যে, জিহাদ ফরজ হওয়ার পরও ইসলাম কখনো কোনো কাফিরকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করেনি। তাই ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য জরুরি হলো, সে শান্ত মনে চিন্তা করবে যে, ইসলামে কী উদ্দেশ্যে এবং কী কী উপকারিতার নিমিত্তে জিহাদ ফরজ করা হয়েছে। তখন সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, যেভাবে সেই ধর্মমত পূর্ণাঙ্গ নয়, যা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে নিজের মতাদর্শের দিকে টেনে নেয়। অনুরূপ সেই ধর্মও পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে রাজনীতির স্থান নেই; আর সেই রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয়, যার সঙ্গে তরবারির সম্পর্ক নেই।

তিন. রাজনীতিহীন ধর্ম এবং তরবারিহীন রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নয়

সেই চিকিৎসক নিজের পেশায় কখনো দক্ষ হতে পারে না, যে শুধু মলম লাগানো কিংবা পট্টি বাঁধতে জানে; কিন্তু পচে-গলে যাওয়া অঙ্গাসমূহের অপারেশন করতে জানে না। কবি বলেন,

আরব বা অনারব যে দলেরই সাথে থাকো
কিছুই হবে না যদি তরবারির সাথে কলম না রাখো।

ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন, যখন পৃথিবীর গোটা দেহে শিরকের বিষাক্ত রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা ব্যাধিগ্রস্ত একটি দেহের মতো হয়ে পড়েছে, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ এটাকে ব্যাধিমুক্ত করতে একজন সংস্কারক ও দরদি চিকিৎসক পাঠালেন। তিনি তাঁর জীবনের ৫৩টি বছর বিরামহীনভাবে প্রতিটি অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ ও শিরা-উপশিরা নিরাময় করে তুলতে চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন। ফলে সংশোধনযোগ্য অঙ্গগুলো সুস্থ হয়ে যায়; আর কিছু অঙ্গ যেগুলো একেবারেই পচে গিয়েছিল, সেগুলো সেরে ওঠার কোনো লক্ষণ বাকি থাকেনি; বরং প্রতিমুহূর্তে এগুলোর বিষক্রিয়া সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলো, তখন অপারেশনের মাধ্যমে সেই অসুস্থ অঙ্গাসমূহ কেটে ফেলাই ছিল যথার্থ করুণা ও প্রজ্ঞার চাহিদা। আর এটাই জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক সব অভিযানের উদ্দেশ্য।

এ কারণে ময়দানে তুমুল যুদ্ধ চলাকালেও ইসলাম তার প্রতিপক্ষের কেবল সে-সকল লোককেই হত্যার অনুমতি দিয়েছে, যাদের রোগ ছিল সংক্রামক। অর্থাৎ, যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করত এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। তবে তাদের নারী, শিশু এবং সে-সকল বৃদ্ধ ও ধর্মীয় পণ্ডিত, যারা যুদ্ধে যোগ দিত না, তারা তখনো মুসলিমদের তরবারি থেকে নিরাপদ ছিল। এমনকি যে-সকল লোক কোনো চাপের মুখে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে আসত, তারাও মুসলিমদের হাত থেকে

নিরাপদ থাকত। ইকরিমা রা. বলেন, 'বদরযুদ্ধে নবিজি ﷺ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি বনু হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে পড়ে যায়, তবে হত্যা করবে না। কারণ, সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে আসেনি; তাকে জোর করে আনা হয়েছে।'[১২২]

বস্তুত রণাঙ্গনে উপস্থিত ও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্তদের মধ্য থেকেও যথাসম্ভব সে-সকল মানুষকে রক্ষা করা হতো, যাদের উত্তম চরিত্র ও সুন্দর শিষ্টাচার সম্পর্কে নবিজি ﷺ জানতেন। নিচের ঘটনাটি আমাদের দাবির পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ :

অষ্টম হিজরিতে যখন রাসুল ﷺ মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে এগোচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে একব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। সে পবিত্র জিহাদকে জাহিলি যুগে আরবদের সাধারণ যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর কাছে আরজ করে, 'আপনি যদি সুন্দর নারী আর লাল উট পেতে চান, তবে বনু মুদাল্লাজ গোত্রের ওপর আক্রমণ করুন।' কেননা, তাদের কাছে এ দুটি প্রচুর রয়েছে! কিন্তু এখানে যুদ্ধ আর সন্ধির উদ্দেশ্যই ছিল অন্য রকম। অতএব, রাসুল ﷺ বললেন, 'মহান আল্লাহ আমাকে বনু মুদাল্লাজের ওপর আক্রমণ করতে এ কারণে বারণ করেছেন যে, তারা পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।'[১২৩]

আলি রা. বলেন, একদিন নবিজির কাছে সাতজন যুদ্ধবন্দি উপস্থিত করা হয়। তিনি তাদের হত্যার জন্য আমাকেই নির্দেশ দেন। ঠিক এমন সময় জিবরিল আ. এসে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, ছয়জনের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ বহাল রাখুন; কিন্তু এই লোককে মুক্ত করে দিন।' নবিজি কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ লোকটি উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল।' নবিজি বলেন, 'আপনি কি নিজের পক্ষ থেকে এই সুপারিশ করছেন, নাকি এটা আল্লাহর নির্দেশ?' জিবরিল বলেন, 'মহান আল্লাহই আমাকে এর আদেশ করেছেন।'[১২৪]

চার. ইসলামি জিহাদ ও পাশ্চাত্যের যুদ্ধ

ইসলামি জিহাদ তথাকথিত সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো পৃথিবী-বিধ্বংসী যুদ্ধ ছিল না, যাতে শুধু নিজেদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে নারী-পুরুষ, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে শহর-নগর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ধ্বংস করা হয়। কবি আকবর ইলাহাবাদি চমৎকার বলেছেন,

ধ্বংসবীণা বেজে উঠেছে,
বিনাশ করেছে ঘর-দোর আর মানুষের প্রাণ

[১২২] *কানজুল উম্মাল :* ৫/২৭২।
[১২৩] *ইহইয়াউল উলুম,* ইমাম গাজালি রা.।
[১২৪] *কানজুল উম্মাল :* ১৩৫; ইবনুল জাওজির উদ্ধৃতি সংবলিত।

গোলার আঘাতে কেঁপে উঠেছে মাঠঘাট
জ্বলেপুড়ে সবকিছু ভস্ম হয়ে যাবে এবার।

তবে বাস্তব সত্য এটাই যে, মানুষ অন্যের চোখে সামান্য জিনিস পড়লেও তা দেখতে পায়; কিন্তু নিজের চোখে যদি কাঠের টুকরোও এসে পড়ে, সেটা দেখে না। কবি আকবর ইলাহবাদি যথার্থই বলেছেন,

নিজের দোষ দেখে না, শুধু অন্যের ওপর মিথ্যা অভিযোগ দেয়
ইসলাম নাকি তরবারির জোরে ছড়িয়েছে, এমন কুৎসা রটায়
এতকিছু বলে, তবু এটা বলে না— তোপ কামান তবে কী ছড়ায়?

মোটকথা, আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম চরিত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, ইসলামের নিরাপত্তাবিধান এবং ইসলাম প্রচারের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হতো, সেগুলোর অপসারণ।[১২৫]

এসব ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাতের পর যেভাবে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ মার্গোলিস (Margolis) ও অন্যদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো এবং লুটতরাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করা, তেমনি ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সাহাবিদের দীর্ঘদিনের আচার-অভ্যাস ও কাজসমূহ একত্রিত করলে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, ইসলামে যেমন নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তা ও ইসলামপ্রচারের বাধাগুলো দূর করতে আক্রমণাত্মক জিহাদও কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ করা হয়েছে। আত্মরক্ষামূলক জিহাদের উদ্দেশ্য যেমন মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো নয়, তেমনি আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্যও কখনো তা হতে পারে না। বিশেষ করে যেখানে উপস্থিত যুদ্ধময়দানেও ইসলাম

---

[১২৫] ইউরোপীয়দের হাতে সংঘটিত সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো যদি সামনে রাখা হয়, যে ইতিহাস স্পেনের উত্থান-পতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহলে তাদের কথিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। খোদ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের বর্ণনা ও স্বীকারোক্তি অনুযায়ী দেখা যায়, নবম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনে হত্যা, গুম, অপহরণসহ এমন কোনো অত্যাচার-নির্যাতন নেই, যা তারা করেনি এবং এর মাধ্যমে জোরপূর্বক মুসলমানদের খ্রিস্টধর্মগ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। হাজার হাজার মুসলমানকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। অসংখ্য মুসলমানকে বন্দি করে তাদের চোখের সামনে তাদের সন্তানদের জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। লাখ লাখ মুসলমান দীন হিফাজতের লক্ষ্যে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রানাডার ময়দানে মুসলিম মনীষীদের লেখা ৮০ হাজার গ্রন্থের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি জ্বালিয়ে ছাই করা হয়েছে। এ ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট ফিলিপ তার সাম্রাজ্যে আরবি ভাষায় একটি শব্দ উচ্চারণকেও অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। সেখানে মুসলিম স্থাপত্যনিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন করা হয়। কর্ডোভার অনন্য সুন্দর জামে মসজিদে একাধিক গির্জা তৈরি করা হয়। বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্যনিদর্শন আল-হামরা ও আজ-জুহরা প্রাসাদ, যাতে ১২ হাজার গম্বুজ ছিল এবং সেখান থেকে প্রতিদিন পাঁচবার আজানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হতো, তাতে গির্জা তৈরি করা হয়, যা আজও বিদ্যমান। দ্র. *গাবিরুল উনস ও হাজিরুহা, মুহাম্মাদ করদ আলি।*

কাফিরদেরকে নিজের আশ্রয়ে স্থান দিতে এবং কুফরির ওপর বহাল থাকা সত্ত্বেও তাদের জানমাল ও সম্ভ্রম রক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে, যেভাবে একজন মুসলমানকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় জিহাদই সমান। এ ছাড়া পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে দুর্বলদের রক্ষা করা ইত্যাদি, যা জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এতেও উভয় প্রকার জিহাদেরই ভূমিকা সমান।

অতএব, সন্দেহের কোনো কারণ নেই যে, ইসলামি ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করতে হবে, যেমনটি আমাদের কোনো কোনো মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ও স্বাধীন চিন্তাবিদরা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি।

হিজরতের পর জিহাদ বা গাজওয়াসমূহের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। সেগুলোর কোনো কোনোটিতে নবিজি ﷺ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন; আর কোনোটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবির নেতৃত্বে বাহিনী পাঠিয়েছেন। ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় প্রথম প্রকার জিহাদকে 'গাজওয়া' এবং দ্বিতীয় প্রকার জিহাদকে 'সারিয়া' বলা হয়। গাজওয়ার মোট সংখ্যা ২৩টি। এর মধ্যে ৯টিতে যুদ্ধ হয়েছিল; আর সারিয়ার সংখ্যা ৪৩টি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এসব গাজওয়া ও সারিয়ার মধ্যে মুসলিমদের যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা আর সেনাস্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয় সর্বদা তাঁদের পক্ষেই ছিল। অবশ্য উহুদযুদ্ধে প্রথমে বিজয় লাভের পর মুসলমানরা সাময়িকভাবে পরাজিত হন। তা-ও এ জন্য যে, সেনাদের একটি অংশ নবিজির আদেশ পুরোপুরি পালন করেনি।

এসব গাজওয়া ও সারিয়াকে আরও সুস্পষ্ট করে বর্ণনার জন্য আমরা একটি ছকে সনভিত্তিক ধারাবাহিক উল্লেখ করছি। তবে গাজওয়া ও সারিয়াসমূহের তারিখ ও সংখ্যার ব্যাপারে যেহেতু মতভেদ রয়েছে, তাই আমরা সেসব মতভেদ পরিহার করে সব বর্ণনায় হাফিজুল হাদিস আল্লামা মুগলতাই রাহ. রচিত সিরাতের ওপরই নির্ভর করেছি।

পাঁচ. গাজওয়া ও সারিয়ার নকশা

সন	গাজওয়া ও সারিয়াসমূহ
প্রথম হিজরি	সারিয়া : এ বছর দুটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে হামজা ও ২. সারিয়ায়ে উবায়দা রা.। কোনো গাজওয়া সংঘটিত হয়নি।

দ্বিতীয় হিজরি	গাজওয়া : এ বছর পাঁচটি গাজওয়া সংঘটিত হয় : ১. গাজওয়ায়ে আবওয়া। এটাকে গাজওয়ায়ে ওয়াদ্দানও বলা হয়। ২. গাজওয়ায়ে বুওয়াত। ৩. গাজওয়ায়ে বদরে কুবরা। ৪. গাজওয়ায়ে বনি কায়নুকা। ৫. গাজওয়ায়ে সাবিক। সারিয়া : এ বছর তিনটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ। ২. সারিয়ায়ে উমায়ের। ৩. সারিয়ায়ে সালিম রা.। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে বদরই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
তৃতীয় হিজরি	গাজওয়া : এ বছর তিনটি গাজওয়া সংঘটিত হয় : ১. গাজওয়ায়ে গাতফান। ২. গাজওয়ায়ে উহুদ। ৩. গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ। সারিয়া : এ বছর দুটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা। ২. সারিয়ায়ে জায়েদ ইবনু হারিসা রা.। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে উহুদই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
চতুর্থ হিজরি	গাজওয়া : এ বছর দুটি গাজওয়া সংঘটিত হয় : ১. গাজওয়ায়ে বনু নাজির ও ২. গাজওয়ায়ে বদরে সুগরা। সারিয়া : এ বছর চারটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে আবু সালামা। ২. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস। ৩. সারিয়ায়ে মুনজির রা.। ৪. সারিয়ায়ে মারসাদ।
পাঞ্চম হিজরি	গাজওয়া : এ বছর চারটি গাজওয়া সংঘটিত হয় : ১. গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা। ২. গাজওয়ায়ে দাওমাতুল জানদাল। ৩. গাজওয়ায়ে মুরাইসি। এটাকে গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিকও বলা হয়। ৪. গাজওয়ায়ে খন্দক। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে খন্দকই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ হিজরি	গাজওয়া : এ বছর তিনটি গাজওয়া সংঘটিত হয় : ১. গাজওয়ায়ে বনু লাহইয়ান, ২. গাজওয়ায়ে গাবাহ, এটাকে গাজওয়ায়ে জি-কারাদও বলা হয়। ৩. গাজওয়ায়ে হুদায়বিয়া। সারিয়া : এ বছর ১১টি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, কারতা অভিমুখে। ২. সারিয়ায়ে আক্কাশা। ৩. সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, জিলকুসসা অভিমুখে। ৪. সারিয়ায়ে জায়েদ ইবনু হারিসা, বনু সালিম অভিমুখে। ৫. সারিয়ায়ে আবদুর রাহমান ইবনু আউফ। ৬. সারিয়ায়ে আলি। ৭. সারিয়ায়ে জায়েদ ইবনু হারিসা, উম্মু কারফা অভিমুখে। ৮. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু আতিক। ৯. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। ১০. সারিয়ায়ে কুরজ ইবনু জাবির। ১১. সারিয়ায়ে আমর আজ জামরি রা.। এ বছরের গাজওয়াসমূহে গাজওয়ায়ে হুদায়বিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সপ্তম হিজরি	এ বছর শুধু গাজওয়ায়ে খায়বার সংঘটিত হয় এবং পাঁচটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে আবু বকর। ২. সারিয়ায়ে বিশর ইবনু সাআদ। ৩. সারিয়ায়ে গালিব ইবনু আবদুল্লাহ। ৪. সারিয়ায়ে বাশির। ৫. সারিয়ায়ে আহজাম রা.।
অষ্টম হিজরি	গাজওয়া : এ বছর চারটি গাজওয়া সংঘটিত হয় : ১. গাজওয়ায়ে মুতা। ২. গাজওয়ায়ে ফাতহে মক্কা। ৩. গাজওয়ায়ে হুনাইন। ৪. গাজওয়ায়ে তায়েফ। সারিয়া : এ বছর ১০টি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে গালিব, বনু মুলাব্বিহ অভিমুখে। ২. সারিয়ায়ে গালিব, ফাদাক অভিমুখে। ৩. সারিয়ায়ে শুজা। ৪. সারিয়ায়ে কাআব। ৫. সারিয়ায়ে আমর ইবনুল আস। ৬. সারিয়ায়ে আবু উবায়দা। ৭. সারিয়ায়ে আবু কাতাদা। ৮. সারিয়ায়ে খালিদ, যাকে গুমাইসাও বলা হয়। ৯. সারিয়ায়ে তুফায়েল ইবনু আমর দাওসি। ১০. সারিয়ায়ে কাতবা রা.।

নবম হিজরি	এ বছর শুধু গাজওয়ায়ে তাবুক সংঘটিত হয়, যা গুরুত্বপূর্ণ গাজওয়াসমূহের একটি। এ ছাড়া তিনটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে আলকামা। ২. সারিয়ায়ে আলি। ৩. সারিয়ায়ে আক্কাশা রা.।
দশম হিজরি	এ বছর কোনো গাজওয়া সংঘটিত হয়নি, তবে দুটি সারিয়া পাঠানো হয় : ১. সারিয়ায়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা., নাজরান অভিমুখে। ২. সারিয়ায়ে আলি, ইয়ামেন অভিমুখে। এ বছরই হুজ্জাতুল বিদা বা বিদায়হজ অনুষ্ঠিত হয়।
একাদশ হিজরি	এ বছর নবিজি ﷺ উসামা ইবনু জায়েদ রা.-এর নেতৃত্বে একটিমাত্র সারিয়া পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা নবিজির ইনতিকালের পর রওনা হয়েছিল।

ছয়. গাজওয়া ও সারিয়া সংখ্যা

১. মোট গাজওয়া ২৩টি, সারিয়া ৪৩টি

উল্লেখ্য, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় 'গাজওয়া' ও 'সারিয়া' শব্দ দুটির প্রয়োগ এত সাধারণভাবে করা হয়েছে যে, সামান্য ঘটনাকেও 'গাজওয়া' ও 'সারিয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো অপরাধীকে বন্দি করতে এক-দুজন সাহাবিকে কোথাও পাঠানো হলে ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় এটাকেও 'সারিয়া' বলা হতো। এমনিভাবে 'গাজওয়া' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইতিহাসবিদরা ব্যাপকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে 'গাজওয়া' ও 'সারিয়া' মোট সংখ্যা উপরে উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ৬৬টি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। নাহয় আমাদের ব্যবহারে গাজওয়া বলতে গুরুত্বপূর্ণ যেসব যুদ্ধকে বোঝানো হয়, তা মাত্র কয়েকটি। যেগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণসহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো :

২. হামজার নেতৃত্বে প্রথম সারিয়া

হিজরতের সাত মাস[১২৬] পর রমজানে রাসুল ﷺ হামজা রা.-কে ৩০ জন মুহাজিরের আমির বানিয়ে সাদা একটি পতাকা হাতে দিয়ে কুরাইশদের এক কাফেলার বিরুদ্ধে

[১২৬] *সিরাতে মুগলতাই* : ৪০। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, এই অভিযান দ্বিতীয় হিজরির শাওয়ালে রওনা হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, এ সারিয়া গাজওয়ায়ে আবওয়ার পরে পাঠানো হয়েছিল।

পাঠান। তাঁরা যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছে পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, তখন মাজদি ইবনু আমর জুহানি মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন।

৩. সারিয়ায়ে উবায়দা ও ইসলামের প্রথম তির নিক্ষেপ

প্রথম হিজরির শাওয়ালে রাসুল ﷺ উবায়দা ইবনুল হারিস রা.-কে ৬০ জন লোকের আমির নিযুক্ত করে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে বাতনে রাগিব অভিমুখে পাঠান। এ যুদ্ধেই সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. কাফিরদের প্রতি তির নিক্ষেপ করেন; আর এটিই ছিল ইসলামের পক্ষ থেকে কাফিরদের ওপর ছোড়া প্রথম তির।

দ্বিতীয় হিজরি

কিবলা পরিবর্তন, গাজওয়ায়ে বদর এবং সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ

এক. কিবলা পরিবর্তন

এ বছর থেকেই ইসলামের জীবনধারায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়—নবিজির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবা শরিফকে মুসলিমদের কিবলা নির্ধারণ করা হয়। কাবা হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ঘর এবং মানুষ যাতে এক দিকে ফিরে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে, এ জন্য এটাকে 'কিবলা' বা সবার মনোযোগের কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়।

দুই. সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ ও ইসলামের প্রথম গনিমত

এ বছরই রজবে আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের নেতৃত্বে ১২ জন সাহাবির ছোট এক বাহিনীকে নাখলা নামক স্থানে কুরাইশের একটি বাণিজ্যকাফেলার উদ্দেশে পাঠানো হয়। কুরাইশের সেই বাণিজ্যকাফেলা যে দিন আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের বাহিনীর মুখোমুখি হয়, ঘটনাক্রমে সে দিন ছিল রজবের প্রথম তারিখ; আর রজব হচ্ছে সেই চারটি মাসের একটি, যেসব মাসে ইসলামের প্রথম যুগে হত্যা ও লড়াই হারাম ছিল। তবে সাহাবিরা সে দিনকে মাসের শেষ দিন অর্থাৎ, জামাদিউস সানির ৩০ তারিখ মনে করছিলেন। যেমন : *লুবাবুন নুকুল* ও *তাফসিরে বায়জাবি*তে ইবনু জারির, তাবরানি ও বায়হাকি থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে।

৩০ তারিখ ধারণা করে তাঁরা পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, কুরাইশ বাণিজ্যকাফেলার মোকাবিলা করা হবে। অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে লড়াই হয় এবং কুরাইশের কাফেলাপ্রধান নিহত হয়। এ ছাড়া দুজন বন্দি হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। ফলে মুসলিমরা বিজয়ী হন এবং প্রচুর গনিমত লাভ করেন। আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ

গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের জন্য রেখে দিয়ে বাকি অংশ সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি গনিমতের সব সম্পদ নিয়ে নবিজির খিদমতে গেলে নবিজি ﷺ তাঁদের বলেন, 'আমি তোমাদের হারাম মাস তথা রজবে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিইনি।' নবিজি তখন গনিমতের এই সম্পদ রেখে দেন এবং পরে বদরযুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের সঙ্গে মিলিয়ে বণ্টন করেন।

এ ঘটনার পর পুরো আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, নবিজি ﷺ নিষিদ্ধ মাসসমূহেও যুদ্ধ বৈধ করে দিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জবাব হিসেবে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়—

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾

> পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে; বলুন, 'তাতে লড়াই করা বড় পাপ।' [সুরা বাকারা : ২১৭]

তিন. গাজওয়ায়ে বদর বা বদরযুদ্ধ

মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরের একটি কূপের নাম বদর। এই কূপের নামে সেখানে একটি গ্রামও রয়েছে। তখনকার দিনে সেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির বেশ গুরুত্ব ছিল। এখানেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ হয়।

মদিনায় বইতে থাকা ইসলামি বসন্তের হাওয়া মক্কার কাফিরদের বেশ ভাবিয়ে তুলছিল—না জানি কখন তা দমকা হাওয়ায় রূপ নিয়ে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়; কিংবা তাদের ব্যবসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিমদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকত। মোটকথা, তাদের গর্ব, অহংকার এবং শক্তির উৎস ছিল শামে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য। বিষয়টি মুসলিমরাও আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে মুসলিমদের জন্য রাজনীতি ও কৌশল হিসেবে কুরাইশদের শক্তির এই উৎস বন্ধ করা জরুরি ছিল।

এ সময় অর্থসংগ্রহ ও যুদ্ধসরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার এক বিশাল বাণিজ্যকাফেলা শামে গিয়েছিল। কুরাইশদের এই বাণিজ্যকাফেলা যখন শাম থেকে ব্যবসা শেষে অস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরছিল, তখন নবিজি ﷺ এ সম্পর্কে জানতে পেরে দ্বিতীয় হিজরির ১২ রমজান ৩১৪ জন মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। রাওহা[১২৭] নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা সেখানে শিবির স্থাপন করেন। কেননা, মুসলিমবাহিনীর কাছে তখন আত্মরক্ষার্থে হামলা করা

[১২৭] রাওহা মদিনা থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণের একটি জায়গার নাম।

ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বিষয়টি আবু সুফিয়ান টের পেয়ে রাস্তা ছেড়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যান। পাশাপাশি তিনি এক অশ্বারোহীকে দ্রুত মক্কার কুরাইশদের কাছে এটা জানাতে পাঠিয়ে দেন যে, কুরাইশরা যেন নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে এবং কাফেলাকে বিপদমুক্ত করে।[১২৮]

এদিকে কুরাইশরা আগ থেকেই মুসলিমদের মূলোৎপাটন করতে বিভিন্ন বাহানা খুঁজছিল। ফলে সংবাদটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৯৫০ জন সশস্ত্র যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য বের হয়। তাদের সঙ্গে ১০০ ঘোড়া এবং ৭০০ উটও ছিল। এ বাহিনীতে কুরাইশের বড় বড় সকল নেতা অংশ নেয়।

চার. সাহাবিদের আত্মত্যাগ

রাসুল ﷺ এ বিষয়ে অবগত হলে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এ সময় আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবি নিজেদের জানমাল নবিজির খিদমতে সঁপে দেন। অল্পবয়সি হওয়ায় উমায়ের ইবনু ওয়াক্কাসকে যুদ্ধ অংশ নেওয়া থেকে বারণ করলে তিনি কান্না শুরু করেন। ফলে নবিজি তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।[১২৯]

এদিকে আনসারদের থেকে খাজরাজের সরদার সাআদ ইবনু উবাদা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।'[১৩০] এ ছাড়া *সহিহ বুখারির* বর্ণনায় রয়েছে, তখন মিকদাদ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার ডানে-বামে, সামনে-পেছনে সব দিক থেকে লড়াই করে যাব।'

রাসুল ﷺ তাঁদের এসব কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এরপর সবাই ঐতিহাসিক বদর-প্রান্তরের সন্নিকটে পৌঁছে জানতে পারেন, আবু সুফিয়ান তাঁর বাণিজ্যকাফেলা নিয়ে এখান থেকে অন্যদিকে চলে গেছেন এবং কুরাইশেরই একটি বিশাল সেনাবহিনী মাঠের অন্য প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যকাফেলা নিরাপদে চলে যাওয়ার পরও আবু জাহল তার লোকজনকে যুদ্ধ স্থগিত না করতে কুপরামর্শ দেয়।

মুসলিমরা তাদের এমন মনোভাব বুঝতে পেরে সামনে অগ্রসর হন এবং দেখতে পান, কুরাইশবাহিনী ময়দানের এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, যেটি যুদ্ধের জন্য বেশ উপযুক্ত। কেননা, পানির উৎসগুলো সেখানেই ছিল। আর মুসলিমবাহিনী ময়দানের

---

[১২৮] আবু সুফিয়ান রা. যেহেতু মক্কাবিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ইসলামের অনেক খিদমত করেছেন, এ জন্য তাঁর নামের সঙ্গে সম্মানসূচক অভিধা যুক্ত করা হয়েছে। —অনুবাদক।

[১২৯] *কানজুল উম্মাল* : ৫/২৭০।

[১৩০] *সহিহ মুসলিম।*

এমন জায়গায় অবস্থান নেয়, যেটি শুষ্ক আর বালুকাময়। এখানে চলাফেরা করাও কঠিন। এ ছাড়া পানিরও কোনো নামগন্ধ ছিল না।

পাঁচ. গায়েবি সাহায্য

আল্লাহ তাআলা মুসলিমবাহিনীর জন্য বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সেভাবেই সবকিছু ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের আগের দিন বৃষ্টি হয়, ফলে বৃষ্টির পানিতে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সেনারা তখন তৃপ্তিভরে পানি পান করেন এবং নিজ নিজ পাত্রগুলোতে পানি ভরে রাখেন। অন্যদিকে এই বৃষ্টি কাফিরদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তারা যেখানে অবস্থান করছিল, সে জায়গায় বৃষ্টির পানিতে কাঁদা জমে পিচ্ছিল হয়ে যায়। হাঁটাচলা করাও তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান শুক্রবার উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধে নাজিল হয়। এ সময় নবিজি ﷺ সেনাদের কাতার ঠিক করতে নিজেই দাঁড়িয়ে যান। ফলে মুসলিমবাহিনী সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যায়।

ছয়. মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা

মাত্র ৩০০ নিরস্ত্র মুসলিম সেনা যখন প্রায় ১ হাজার অস্ত্রসজ্জিত সেনার মোকাবিলা করছে, এ সময় যদি মাত্র একজন লোকও তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, তাহলে সেটা অত্যন্ত উপকারী মনে করা হবে। তবে ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এমন কঠিন মুহূর্তে পাওয়া সাহায্য থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে, তখন হুজায়ফা ও আবু হাসানা রা. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রণাঙ্গণে এসে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁরা রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'কাফিররা রাস্তায় আমাদের আটক করেছিল। তখন তারা আমাদের জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কি মুহাম্মাদকে সাহায্য করতে যাচ্ছ?" আমরা তা অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশ নেব না বলে প্রতিশ্রুতি দিই।' নবিজি যখন তাঁদের এমন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তাঁদের বিরত রাখেন এবং বলেন, 'আমরা সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট।'[১৩১]

এরপর মুসলিম সেনাদের কাতার সোজা করা হলে তখনকার রীতি অনুযায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে লড়াই শুরু হয়। কুরাইশদের থেকে তিনজন বীর—উতবা ইবনু রাবিআ, শায়বা

---

[১৩১] *সহিহ মুসলিম।*

ইবনু রাবিআ ও ওয়ালিদ ইবনু উতবা লড়াইয়ের জন্য সামনে আসে; আর মুসলিমদের থেকে হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব, উবায়দা ইবনু হারিস ও আলি ইবনু আবি তালিব রা. তাদের মোকাবিলা করেন। কুরাইশের পক্ষের তিনজনই নিহত হয়। মুসলিমদের শুধু উবায়দা রা. আহত হন। আলি রা. তখন তাঁকে কাঁধে করে নবিজির কাছে নিয়ে আসেন। নবিজি তাঁকে নিজের উরুতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর চেহারা থেকে ধুলোবালি নিজ হাতে পরিষ্কার করে দেন। এ সম্পর্কে কবি বলেন,

বন্ধু আমার আঁচল দিয়ে মুছে দিচ্ছেন অশ্রু
আজকের কান্নায় তাই আছে আনন্দের কারণ।

উবায়দা রা. শাহাদাত-মুহূর্তে নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম?' নবিজি বলেন, 'না, তুমি নিশ্চয় শহিদ এবং আমি নিজেই এর সাক্ষী।' নবিজির মুখে এ কথা শুনে উবায়দা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলতে থাকেন, 'আজ যদি আবু তালিব বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁকে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হতো যে, আমিই হলাম তাঁর কবিতার উপযুক্ত ব্যক্তি।'[১৩২]

এরপর উবায়দা রা. ইনতিকাল করলে খোদ রাসুল ﷺ তাঁর কবরে নামেন এবং নিজ হাতে তাঁকে দাফন করেন। সাহাবিদের মধ্যে বিশেষ এই মর্যাদা কেবল উবায়দা রা.-এর ভাগ্যেই জুটেছিল।[১৩৩]

সাত. যুদ্ধে সাহাবিদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ

বদরের ময়দানে কাফির ও মুসলিমবাহিনী যখন মুখোমুখি হয়, তখন এমন পরিস্থিতিও দেখা যায় যে, নিজেদের অনেক আত্মীয়স্বজন আর কলিজার টুকরো আপনজন তরবারির নিচে এসে গেছেন; কিন্তু আল্লাহর বাহিনীর তখন এ বিশ্বাস ছিল যে,

হাজারো আত্মীয় হয়ে গেছে আল্লাহবিমুখ,
তারা কেউই এখন আর আমার আত্মীয় নয়

---

১৩২ নবিজির চাচা আবু তালিব, যিনি সবসময় নবিজির সাহায্য-সহযোগিতা করতেন—তিনি তাঁর সহযোগিতা-প্রেরণা সম্পর্কে এই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন,

كَذَبْتُم وَبَيْتِ اللهِ نبري مُحَمَّداً • وَلَمَّا نطاعِن دونَهُ وَنناضل
وَنُسلِمهُ حَتّى نُصرعَ حَولَهُ • وَنذهلَ عَن أَبنائِنا وَالحَلائِل

পবিত্র কাবার শপথ, তোমাদের এই ধারণা একেবারে ভুল যে, আমরা মুহাম্মাদকে তির ও বর্শার সামনে লড়াই না করেই ছেড়ে দেবো অথবা শত্রুর হাতে তুলে দেবো। না, এটা হতে পারে না। যতক্ষণ-না আমাদের লাশ তাঁর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে এবং আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ভুলে থাকব।

১৩৩ কানজুল উম্মাল : ৫/২৬৭।

আল্লাহর তরে নিজেদের সঁপে দেয় যাঁরা,
শুধু তাঁরাই আমার আত্মীয় হয়।

সুতরাং আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ছেলে—যিনি তখনো মুসলমান হননি—যখন যুদ্ধমাঠে নেমে আসেন, তখন খোদ আবু বকরের তরবারি তার দিকে এগিয়ে যায়। এদিকে উতবা যখন ছেলে হুজায়ফার সামনে পড়ে, তখন ছেলে হয়েও তিনি পিতার দিকে তরবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে যান। উমরের তরবারি তো তাঁর আপন মামার পরিণতির মীমাংসা করে দেয়।[১০৪]

এরপর তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধময়দানে তখন ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন সময় রাসুল ﷺ সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দুআ করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে সাহায্যের ঘোষণা দিলে তিনি আশ্বস্ত হন।

আট. আবু জাহলকে হত্যা

আবু জাহলের অপকর্ম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা সম্পর্কে সবাই জানতেন, ফলে আনসারদের মধ্যে কিশোর মুআজ ও মুআওয়িজ নামের দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরা যখনই তাকে দেখবেন, তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করবেন অথবা নিজেরা শহিদ হয়ে যাবেন।

বদরের যুদ্ধকে সুযোগ মনে করে নিজেদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে দুই ভাই বের হন; কিন্তু তাঁরা আবু জাহলকে কখনো দেখেননি, তাই তাকে চিনতেন না। তাঁরা আবদুর রাহমান ইবনু আউফকে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু জাহল লোকটা কে?' আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রা. তখন ইশারায় তাকে দেখিয়ে দেন। আবু জাহলকে দেখামাত্রই তাঁরা বাজপাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই কাফির সরদার আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ সময় আবু জাহলের পাশেই যুদ্ধ করছিলেন তার ছেলে ইকরিমা। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি পিতার এই করুণ দশা দেখে প্রথমে ভড়কে যান। এরপর পেছন দিক থেকে এসে মুআজ রা.-এর বাহুতে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। ফলে তাঁর হাতটি কেটে যায় এবং শরীর থেকে আলাদা হয়ে চামড়ার সামান্য অংশে ঝুলে থাকে। এ অবস্থায়ই তিনি ইকরিমার পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু ইকরিমা দৌড়ে পালিয়ে যান।

মুআজ রা.-এর কর্তিত হাতটি তখনো ঝুলে ছিল এবং এতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল, এ জন্য তিনি সে হাতটি পায়ের নিচে রেখে এক টানে ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর ছিঁড়ে ফেলা

---

[১০৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম* ও *আল ইসতিআব*, ইবনু আবদিল বার রাহ.।

হাত দূরে নিক্ষেপ করে আবারও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১৩৫]

নয়. একমুঠো পাথরকণা দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করা এবং ফেরেশতাদের সাহায্য

আল্লাহ তাআলার আদেশে রাসুল ﷺ একমুঠো মাটি বা পাথর নিয়ে শত্রুদের প্রতি ছুড়ে মারেন এবং সাহাবিদের নির্দেশ দেন, 'একযোগে তোমরা তাদের ওপর হামলা চালাও।' এদিকে রাসুলের নিক্ষিপ্ত পাথর তাদের সবার চোখে বিদ্ধ হয়।

নবিজির নির্দেশ পেয়েই সাহাবিদের ছোট এই বাহিনী কাফিরদের দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

এ যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় অনেক নেতা নিহত হয়। এতে করে মুশরিক সেনাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং পরাজিত হয়ে তারা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালায়। মুসলিমরা তখন শত্রুবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দি করেন। এভাবে কাফিরদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়। নিহতের মধ্যে কুরাইশের নেতা আবু জাহল, উমাইয়া ইবনু খালফ, শায়বা ইবনু রাবিআ, তার ভাই উতবা এবং তার ছেলে ওয়ালিদ ইবনু উতবা গং ছিল। অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার সাহাবি ছিলেন।

উল্লেখ্য, এ যুদ্ধ বা গাজওয়া মূলত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে প্রকাশ্য একটি মুজিজা। এমন না হলে এই অসম যুদ্ধে অল্পসংখ্যক মুসলিমবাহিনীর বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মাত্র ৩১৪ জন নিরস্ত্র মুসলমানের মোকাবিলায় কুরাইশের ১ হাজার স্বশস্ত্র সেনার বিশাল বাহিনীর পরাজয় বিস্ময়ের অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা, বিপক্ষদলে নেতৃস্থানীয় বিত্তশালী এমন অনেক লোক ছিল, যাদের একেকজন পুরো বাহিনীর খাবার ও অন্যান্য খরচ বহনের সক্ষমতা রাখত। আর তাদের মোকাবিলায় ছিল অস্ত্র ও সহায়-সম্বলহীন সামান্য কিছু মুসলমান। এদিকে কাফিরবাহিনীতে ছিল ১০০ অশ্বারোহী; আর মুসলিমবাহিনীতে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া! কুরাইশদের কাছে ছিল বিশাল অস্ত্রভান্ডার; আর মুসলিমবাহিনীতে হাতেগোনা কয়েকটি তরবারি।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে যেসব বিষয় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছিল, তা ছিল নাখলার খণ্ডযুদ্ধ, কাফিরদের রণপ্রস্তুতি, আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার, যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য ওহি লাভ, মক্কাবাসীর ক্ষোভ ইত্যাদি। আর পরোক্ষ কারণ হিসেবে দেখা হয়, মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কুরাইশদের হিংসা, আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও ইয়াহুদিদের

[১৩৫] *সিরাতে হালবিয়া* : ১/৫৫৪।

ষড়যন্ত্র, কুরাইশদের যুদ্ধের হুমকি, তাদের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা, কাফিরদের আক্রান্ত হওয়ার ভয়, ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির ধ্বংস এবং রাসুল ﷺ-কে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার কাফিরদের অশুভ মনস্কামনা।

এ ছাড়া বদরযুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর বিজয় কুরাইশদের অবাধ বাণিজ্য এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের ওপর অন্যায় প্রভাব খাটানোর পথ বন্ধ করে দেয়। মদিনার উপকণ্ঠে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের যে ধারা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল, যার পেছনে কুরাইশ-নেতাদের সহযোগিতা ও প্রশ্রয় ছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মুসলিমবাহিনীর এই বিজয়ে স্বস্তি প্রকাশ করে মদিনা ও আশপাশের সর্বস্তরের মানুষ। তারা স্বাগত জানায় সত্যপক্ষের এই মহান বিজয়কে।

ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরা বদরের এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করে যে, এটা কীভাবে সম্ভব হলো? তারা তো জানে না, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এবং সফলতা-ব্যর্থতা ঘোড়া, অস্ত্র, তির-তরবারি বা রসদনির্ভর নয়; বরং তাতে অন্য কারও হাত থাকে। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থায় বিশ্বাসী এবং আগুন ও বাতাসের পূজারিরা বিজয়ের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কীভাবে জ্ঞান লাভ করবে? কবি আকবর ইলাহাবাদির ভাষায়,

ইউরোপ আজ ছেড়ে দিয়েছে আসমানি পিতাকে
বিদ্যুৎ ও বাতাসকে গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের খোদা হিসেবে

দশ. বদরের যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ এবং সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা

বদরের যুদ্ধবন্দিরা মদিনায় পৌঁছার পর নবিজি ﷺ সাহাবিদের মধ্যে সেই বন্দিদের ভাগ করে দেন। পাশাপাশি সবাইকে নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন বন্দিদের যথাযথ সেবাযত্ন করেন। ফলে সাহাবিরা তাদের ভালো খাবার খাওয়াতেন, আরামে রাখতেন; আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন।

মুসআব ইবনু উমায়ের রা.-এর ভাই আবদুল আজিজও যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাকে যে আনসার সাহাবির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যখন খাবার নিয়ে আসতেন, তখন আমার সামনে রুটি রেখে দিতেন এবং তিনি শুধু খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন।'[১৩৬]

যুদ্ধ শেষে রাসুল ﷺ মদিনায় পৌঁছার পর সাহাবিদের সঙ্গে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে

---

[১৩৬] *তাফসিরুত তাবারি।*

পরামর্শ করেন। তখন এ সিদ্ধান্ত হয় যে, মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ফলে ৪ হাজার দিরহাম করে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এগারো. ইসলামি সাম্য

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে নবিজির সম্মানিত চাচা আব্বাসও ছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে মুসলমান হন। আব্বাস রা. রাত হলে তাঁর এই বন্দিদশার কারণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর এই যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ নবিজির কানে পৌঁছতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। সকাল হলে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি রাতে ঘুমাননি কেন?' নবিজি বলেন, 'আমি কীভাবে ঘুমাই; অথচ আমার সম্মানিত চাচার কষ্টের আওয়াজ আমার কানে আসছে?'[১০৭]

ইসলাম কিন্তু এ সুযোগ দেয়নি যে, নিজের সম্মানিত ও বৃদ্ধ চাচাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা যাবে। অন্যান্য বন্দিদের কাছ থেকে যে পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে, তাঁর থেকেও তা-ই আদায় করা হয়েছে; বরং সাধারণ বন্দিদের থেকে একটু বেশিই নেওয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। কেননা, সাধারণ বন্দিদের থেকে ৪ হাজার দিরহাম এবং ধনী ও নেতৃপর্যায়ের বন্দিদের থেকে কিছু বেশি নেওয়া হয়েছে। আব্বাস রা. ছিলেন ধনিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তাই তাঁকে ৪ হাজার দিরহাম থেকে কিছু বেশি দিতে হয়েছিল। এ সময় আনসার সাহাবিরা নবিজির কাছে আবেদন করেন, আব্বাসের মুক্তিপণ যেন ক্ষমা করা হয়। কিন্তু ইসলামি সাম্যে আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু ও বন্ধু সবাই সমান। এ জন্য অনেক বলার পরও আনসারদের এই আবেদন গৃহীত হয়নি।

ঠিক এভাবেই নবিজির জামাতা আবুল আসও যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তাঁর কাছে মুক্তিপণ দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। তখন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, নবিকন্যা জায়নাবের কাছে তিনি সংবাদ পাঠান, তিনি যেন মুক্তিপণের অর্থ পাঠিয়ে দেন। কেননা, তিনি তখন মক্কায় ছিলেন। জায়নাব রা.-এর গলায় একটি হার ছিল। এটি তাঁর মা খাদিজা রা. তাঁর বিয়ের সময় উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। জায়নাব গলা থেকে সেটি খুলে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। নবিজির সামনে যখন হারটি উপস্থাপন করা হয়, তখন তিনি সেটি দেখে কেঁদে ফেলেন। তিনি সাহাবিদের বলেন, 'এটি জায়নাবের মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। যদি তোমরা সম্মত হও, তাহলে হারটি তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও।' সাহাবিরা নবিজির এই প্রস্তাব খুশিমনে মেনে নেন। এরপর রাসুল ﷺ আবুল আসকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, তিনি জায়নাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেবেন।[১০৮]

---

[১০৭] *কানজুল উম্মাল : ৫/২৭২।*

[১০৮] *মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩৪৬।*

বারো. বন্দিদের সঙ্গে সদাচার

বদরের যুদ্ধবন্দিদের কাছে পরার মতো কাপড় ছিল না, তাই রাসুল ﷺ তাদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করেন। এদিকে যুদ্ধবন্দি নবিজির সম্মানিত চাচা আব্বাস রা. এতটাই লম্বা আকৃতির ছিলেন যে, কোনো জামাই তাঁর শরীরে খাপ খাচ্ছিল না। তখন মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তার জামাটি আব্বাসকে দিয়ে দেয়। এরপর রাসুল ﷺ তাঁর একটি জামা আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে দিয়েছিলেন, এটাকে মূলত সেই উপকারের প্রতিদান গণ্য করা হয়।[১৩৯]

তেরো. আবুল আসের ইসলামগ্রহণ

নবিজির জামাতা আবুল আস মুক্তিলাভের পর মক্কা ফিরে গিয়েই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্ত্রী জায়নাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয়বার শাম থেকে ব্যবসাপণ্য নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে মুসলিমদের হাতে বন্দি হন এবং এবারও তাঁকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বারের মতো মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় চলে যান এবং সকল অংশীদারের মাল তাদের বুঝিয়ে দিয়ে মুসলমান হয়ে যান। এরপর তিনি লোকদের বলেন, 'আমার কাছে তোমাদের আর কোনো পাওনা আছে?' জবাবে তারা বলে, 'না, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিন। আমরা তোমাকে চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারী হিসেবে পেয়েছি।' আবুল আস বলেন, 'আমি তোমাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।' মদিনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম; কিন্তু এ জন্য দিইনি যে, তোমরা তখন ধারণা করতে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছি; অথবা আমাকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে।' আল্লাহ যখন আমাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।'[১৪০]

এরপর আবুল আস রা. মদিনায় রাসুলের খিদমতে হাজির হন। রাসুল তাঁকে সসম্মানে বরণ করেন এবং স্ত্রী জায়নাবকেও তাঁর হাতে তুলে দেন।

আবুল আস রা. ইসলামগ্রহণের পর রাসুলের সঙ্গে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। আবু বকরের খিলাফতকালে ১২ হিজরির জিলহজে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৪১]

---

[১৩৯] *সহিহ বুখারি।*

[১৪০] *তারিখুত তাবারি।*

[১৪১] *আল-ইসতিআব : ৪/১৭০৪।*

দুই. নবিজির সঙ্গে হাফসা ও জায়নাবের বিয়ে

তৃতীয় হিজরির শাবানে উম্মুল মুমিনিন হাফসা এবং রমজানে জায়নাব বিনতু খুজাইমা রা. নবিজির সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৪৩]

তিন. গাজওয়ায়ে উহুদ বা উহুদযুদ্ধ

উহুদ মদিনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি পাহাড়ের নাম। সেখানে হারুন আ.-এর কবর রয়েছে। সবার ঐকমত্যে উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরির শাওয়ালে সংঘটিত হয়। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, এর নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন: ৭, ৯, ১০ ও ১১ শাওয়াল।[১৪৪]

বদরযুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের গ্লানি এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার ফলে দুঃখের বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছিল। এই শোক, ক্ষোভ-দুঃখ নিয়ে যদিও তারা একটি বছর পার করেছে; কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল। এমনকি তাদের নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করতেও লোকদের নিষেধ করে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে তারা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৩ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া এবং ৩ হাজার উট ছিল। এমনকি ১৪ জন মহিলাকে তারা এ জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল যে, এরা তাদের পুরুষদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবে এবং যারা পালাতে চায়, এরা তাদের তিরস্কার ও লজ্জা দেবে।

এদিকে নবিজির চাচা আব্বাস রা.—যিনি এ সময় ইসলাম কবুল করে নিয়েছেন, তবে তখনো মক্কাতেই ছিলেন—কুরাইশদের এমন আয়োজন ও যুদ্ধপ্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিতবোধ করেন। এ জন্য তিনি এর বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে চিঠিসহ দ্রুতগামী একজন দূতকে মদিনায় নবিজির কাছে পাঠিয়ে দেন।

নবিজি ﷺ এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোককে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে সংবাদ দেন যে, কুরাইশরা মদিনার উপকণ্ঠে এসে গেছে। যেহেতু মদিনা শহরে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শহরের চারদিকেই পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। সকালে নবিজি ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরপর ১ হাজার সেনার এক বাহিনী নিয়ে মদিনার বাইরে চলে আসেন। এ বাহিনীতে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সমমনা ৩০০ মুনাফিকও

---

[১৪৩] *সিরাতে মুগলতাই : ৪৯।*

[১৪৪] *শারহুল মাওয়াহিব, জুরকানি : ২/২০।*

ছিল। তবে তারা পথিমধ্যেই বাহিনী ছেড়ে ফিরে আসে। ফলে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা কমে ৭০০ জনে দাঁড়ায়।[১৪৫]

চার. সেনাবিন্যাস ও সাহাবি-সন্তানদের জিহাদি স্পৃহা

মদিনা থেকে বেরোনোর পর মুজাহিদের যখন চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করা হয়, তখন অল্পবয়সি কিশোর মুজাহিদদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ-সকল কিশোরের অন্তরে জিহাদের প্রতি আন্তরিকতা ও স্পৃহা ছিল অতুলনীয়। রাফি ইবনু খাদিজকে যখন বলা হয়, 'তোমার বয়স কম, তুমি মদিনায় ফিরে যাও।' তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান, যেন তাঁকে লম্বা ও উঁচু মনে করা হয়! তাঁর আগ্রহ দেখে শেষপর্যন্ত তাঁকে বাহিনীতে যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সামুরা ইবনু জুনদুব রা.—যিনি রাফি ইবনু খাদিজের সমবয়সি ছিলেন—তিনি যখন এ ঘটনা দেখেন, তখন নবিজির কাছে আবেদন করেন, 'আমি তো রাফিকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে থাকি। তাঁকে যদি যুদ্ধের জন্য মনোনীত করা হয়, তাহলে তো আমাকে আরও আগেই নেওয়া উচিত!' তাঁর কথামতো রাফি ও সামুরাকে কুস্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কুস্তিতে সামুরা রাফি ইবনু খাদিজকে পরাস্ত করেন। ফলে তাঁকেও বাহিনীতে যুক্ত করা হয়।[১৪৬]

যারা বলে, 'ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' তারা কি এসব আত্মত্যাগের ঘটনা দেখেও নিজেদের মিথ্যা কথার কারণে লজ্জিত হবে না?

এরপর উহুদের ময়দানে পৌঁছে রাসুল ﷺ মুজাহিদদের বিন্যাস করে কাতারবন্দি করে দাঁড় করান। উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধের কৌশল ঠিক করেন। কেননা, এ দিক দিয়ে শত্রুদের এগিয়ে আসার আশঙ্কা ছিল। ফলে এই কৌশল একদিকে ছিল ঝুঁকিপূর্ণ আবার অন্যদিকে সুবিধাজনক বটে। উহুদের পেছন দিক থেকে একজায়গা দিয়ে হামলার আশঙ্কা ছিল, এ জন্য নবিজি সেখানে ৫০ জনের এক তিরন্দাজবাহিনীকে

---

[১৪৫] মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই উহুদযুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম ধোঁকা দিয়েছিল। যুদ্ধে মুসলিমদের ১ হাজার বাহিনীর মধ্যে ৩০০ জন ছিল তার সঙ্গী। সে কাফেলার সঙ্গে মদিনা থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ মুসলিমদের সঙ্গে ছিল। পরে এ কথা বলে সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে যায় যে, আমাদের পরামর্শ ছিল মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করব, এখন আমাদের পরামর্শ কেন মানা হলো না? আরও বলে যে, এটা যুদ্ধ নয় বরং আত্মহত্যা। এ ছাড়া সে ও তার সাথিরা যুদ্ধে যেতে মুসলিমদেরও বাধা দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মুসলমানদের আস্তিনে পালিত প্রথম বড় সাপ। ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংসের জন্য এমন কোনো ষড়যন্ত্র নেই, যা সে করেনি। যদি আল্লাহর একান্ত সাহায্য না থাকত, তাহলে মুসলিমরা পরস্পরে যুদ্ধ করেই মারা যেতেন এবং মাত্র কয়েক বছরেই ইসলামের নামনিশানা পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যেত। তার মতাদর্শী ইয়াহুদিরা তার মৃত্যুর পরও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, যারা পরবর্তী শতাব্দীতে মুসলিমদের মধ্যে অসংখ্য আস্তিনের সাপ ঢুকিয়ে দেয়। *আস্তিনের সাপ*, ইসমাইল রেহান : ১৬। —অনুবাদক।

[১৪৬] *তারিখুত তাবারি* : ৩য় খণ্ড।

পাহারার দায়িত্ব দিয়ে কঠোরভাবে তাঁদের নির্দেশ দেন, 'মুসলিমদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তোমরা এখানে অটল থাকবে।'

এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনী কুরাইশদের পিছু হটাতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ে মুসলিমবাহিনী বিজয়ী হিসেবে যুদ্ধময়দানে অবস্থান করে; আর কুরাইশরা মনোবল হারিয়ে এদিকে-সেদিক পালাতে থাকে। মুসলিম সেনারা তখন যুদ্ধময়দানে গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে পাহাড়ের ওই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নবিজি যে ৫০ জন সেনাকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁদের অনেকে মুসলিমদের বিজয় হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে সেখান থেকে চলে আসেন। তবে তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. বার বার নিষেধ করছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের নেতার কথা মানেননি। তবে এরপরও কয়েকজন সেখানে থেকে যান।

এ জায়গাটি প্রায় ফাঁকা দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ—যিনি তখনো মুসলমান হননি এবং কুরাইশের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন—পেছন দিক থেকে আচমকা আক্রমণ করে যুদ্ধের দৃশ্য পালটে দেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরসহ তাঁর সঙ্গে থাকা অল্প কয়েকজন সাহাবি প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান, তবে শেষপর্যন্ত সবাই শাহাদতবরণ করেন।

এবার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমান ও কাফির উভয় বাহিনী তখন যুদ্ধময়দানে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে, মুসলমান মুসলমানের হাতেই নিহত হতে থাকেন।

এ যুদ্ধে মুসআব ইবনু উমায়ের রা. শহিদ হন। তাঁর চেহারার সঙ্গে নবিজির চেহারার অনেক মিল ছিল। ফলে তাঁর শাহাদাতের পর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসুল ﷺ শহিদ হয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, শয়তান বা মুশরিকদের কেউ একজন উচ্চৈঃস্বরে এ ঘোষণা দেয় যে, 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন।'[১৪৭]

এই মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের মনোবল ভেঙে যায়। এমনকি বড় বড় অনেক সাহাবিও হতাশ হয়ে যান। তবে অনেকে তখনো অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলিমদের হাতে মুসলিমরা শহিদ হতে থাকেন। তবে সবার দৃষ্টি তখন নবিজিকে খুঁজে ফিরছিল। এরপর কাআব ইবনু মালিক রা. প্রথমে তাঁকে দেখতে পান। তিনি আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার দিয়ে ওঠেন, 'মুবারক হো, নবিজি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।'

কাআব ইবনু মালিকের এ আওয়াজ যখন সাহাবিরা শুনতে পান, তখন সবাই নবিজির

---

[১৪৭] *শারহুল মাওয়াহিব, জুরকানি* : ২/৩০।

কাছে দৌড়ে আসতে থাকেন। এ সময় কাফিররা অন্য দিক থেকে সরে এসে এদিকে মনোনিবেশ করে। তারা কয়েকবার নবিজির ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তবে তিনি নিরাপদই থাকেন। এমনকি কাফিররা একবার কঠোর আক্রমণ করলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, 'কে আছে এমন, যে আমার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?' তখন জিয়াদ ইবনু সাকান রা. নিজের চার সঙ্গীসহ তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শেষপর্যন্ত সবাই শহিদ হন। জিয়াদ রা. যখন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান, তখন রাসুল ﷺ বলেন, 'তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' সাহাবিরা তাঁকে পাঁজাকোলা করে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তখনো তাঁর প্রাণ বাকি ছিল। জিয়াদ নবিজির পায়ের ওপর নিজের মুখ রাখেন এবং এ অবস্থায়ই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

পাঁচ. নবিজির চেহারা মুবারক আহত হওয়া

কুরাইশদের প্রখ্যাত বীর আবদুল্লাহ ইবনু কুমাইয়া সেনাদের সারি ভেদ করে সামনে এগিয়ে যায় এবং নবিজির চেহারা মুবারকে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। ফলে নবিজির মাথায় পরিহিত শিরস্ত্রাণের (লোহার টুপি) দুটি কড়া মুখ ভেদ করে ঢুকে যায় এবং একটি দাঁত শহিদ হয়। তখন আবু বকর রা. শিরস্ত্রাণের কড়া দুটি ক্ষতস্থান থেকে ওঠাতে এগিয়ে এলে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, এ খিদমতটি আমাকে করার সুযোগ দিন।' তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত না লাগিয়ে নিজের মুখ দিয়ে সেই কড়া দুটিতে টান দেন। এতে করে যদিও একটি কড়া বেরিয়ে আসে; কিন্তু এর সঙ্গে আবু উবায়দার একটি দাঁতও উপড়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে আবু বকর দ্বিতীয় কড়াটি বের করতে সামনে এগিয়ে এলে তখন আবু উবায়দা আবারও কসম দিয়ে তাঁকে বিরত রাখেন এবং নিজেই তাতে মুখ লাগিয়ে টান দেন। এবারও তাঁর আরেকটি দাঁত উঠে আসে![১৪৮]

এ সময় কাফিরদের তৈরি একটি গর্তে রাসুল ﷺ পড়ে যান। মুসলিমদের ভূপাতিত করতেই তারা এটা খুঁড়েছিল।

ছয়. সাহাবিদের আত্মত্যাগ

এ অবস্থা দেখে প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবিরা নবিজিকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ান। তখন তরবারির ঝনঝনানি ও তিরবৃষ্টি হচ্ছিল। সাহাবিরা ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়ে সেগুলো নিজেদের শরীরে বিদ্ধ করতে থাকেন। আবু দুজানা রা. তো নিজেকে নবিজির ঢাল

---

[১৪৮] *ইবনু হিব্বান, দারা কুতনি, তাবরানি ইত্যাদি। কানজুল উম্মাল : ২/২৭৪।*

বানিয়ে রাখেন। এদিকে কাফিরদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলো তাঁর শরীরে বিদ্ধ হতে থাকে। তালহাও তির-তরবারির আঘাতগুলো নিজের শরীর দিয়ে প্রতিহত করছিলেন। ফলে তাঁর একটি হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।[১৪৯] যুদ্ধ শেষে হিসাব করে দেখা যায়, তালহার শরীরে ৭০টিরও বেশ আঘাত রয়েছে![১৫০]

আবু তালহা রা. একটি ঢালের মাধ্যমে নবিজিকে হিফাজত করছিলেন। নবিজি ﷺ যখনই ঘাড় উঁচিয়ে সেনাদের দিকে তাকাতেন, তখন আবু তালহা বলতেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি মাথা ওঠাবেন না। শত্রুরা নিপাত যাক। আপনার শরীরে যাতে কোনো তির না লাগে, এ জন্য আপনার আগে আমার বুক প্রস্তুত রয়েছে।'

এ সময় এক সাহাবি এসে নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তাহলে অবস্থান কোথায় হবে?' তিনি বলেন, 'জান্নাত।' এই সাহাবির হাতে তখন কয়েকটি খেজুর ছিল এবং তিনি সেগুলো খাচ্ছিলেন। নবিজির এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে সোজা যুদ্ধের ময়দানে চলে যান এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন।[১৫১]

এদিকে কুরাইশের হতভাগারা নবিজির ওপর নির্দয়ভাবে তির নিক্ষেপ করছিল; কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামিনের পবিত্র জবানে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল,

اَللّٰهُمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

হে আল্লাহ, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। তারা তো জানে না।

নবিজির চেহারা মুবারক থেকে তখনো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল; আর রহমতের নবি তাঁর চেহারা থেকে সেই রক্ত মুছে নিচ্ছিলেন। নবিজি বলেন, 'যদি এই রক্তের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়ত, তাহলে সবার ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসত।'[১৫২]

এদিকে নবিজির দৃঢ় অবস্থানের কারণে কাফিররা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যায় এবং ঘোষণা দেয়, আগামী বছর বদরে আবার মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

এ যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ৭০ জন শহিদ হন; আর কাফিরদের পক্ষে মাত্র ২২ বা ২৩ জন নিহত হয়।

[১৪৯] *সহিহ বুখারি।*

[১৫০] *ইবনু হিব্বান, দারা কুতনি, তাবরানি ইত্যাদি; কানজুল উম্মাল : ৫/২৭৪।*

[১৫১] *সহিহ বুখারি*, গাজওয়ায়ে উহুদ অধ্যায়।

[১৫২] *ফাতহুল বারি* : ১৬/৪৮, গাজওয়ায়ে উহুদ অধ্যায়।

চতুর্থ হিজরি

বিরে মাউনা অভিমুখে সারিয়ায়ে মুনজির

এ বছরই সফর মাসে রাসুল ﷺ ৭০ জন সাহাবির এক বাহিনীকে নাজদের লোকদের কাছে ইসলামপ্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠান। এ বাহিনীতে বিখ্যাত অনেক আলিম ও কারি সাহাবি ছিলেন।

এ বাহিনী নাজদে পৌঁছে দেখতে পায়, সেখানে আমির, রা'ল, জাকওয়ান ও আসাইয়া গোত্রের লোকেরা তাঁদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শেষপর্যন্ত লড়াই হয় এবং ঘটনাক্রমে সকল সাহাবিই শহিদ হয়ে যান। নবিজির কাছে যখন মর্মন্তুদ এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছায়, তখন তিনি এতই ব্যথিত ও মর্মাহত হন যে, এই ৭০ জন সাহাবির হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কয়েকদিন ফজরের নামাজে বদদুআ করতে থাকেন।[১৫৩]

এ বছরের শাওয়ালে হাসান রা. জন্মান এবং উম্মু সালামা রা. নবিজির সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।

[১৫৩] *সিরাতে মুগলতাই : ৫২।*

পঞ্চম হিজরি

কুরাইশ ও ইয়াহুদিদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র এবং আহজাবযুদ্ধ

এক. কুরাইশ ও ইয়াহুদিদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র

নবিজি যখন মদিনায় আসেন, তখন এখানকার ইয়াহুদিদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। তিনি সর্বদা এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; কিন্তু ইয়াহুদিদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ উলটো। নবিজির আগমনের পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি ও শক্তি দেখে তাদের মনে হিংসা, ক্ষোভ আর ক্রোধ সৃষ্টি হয়। এ জন্য তারা সবসময় নবিজিসহ সকল মুসলিমের বিরোধিতায় নিয়োজিত থাকে।

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের বিস্ময়কর বিজয় ইয়াহুদিদের ক্ষোভ ও হিংসা আরও বাড়িয়ে দেয়। সুপ্ত এই বিদ্বেষ শেষপর্যন্ত প্রকাশ্যে চলে আসে। এবার তারা খোলাখুলি চুক্তি লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখাতে শুরু করে। দ্বিতীয় হিজরিতে তাদের একটি গোত্র বনু কায়নুকা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে, বনু নাজির নবিজিকে হত্যার পাঁয়তারা এবং মদিনায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়। অবস্থাদৃষ্টে নবিজি ﷺ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেন। তাদের মোকাবিলা করা হলে সকল ইয়াহুদি দুর্গে আত্মগোপন করে। ফলে এভাবেই তারা দুর্গে কিছুদিন আত্মগোপনে থাকে। পরে নবিজি মদিনা থেকে বনু কায়নুকা ও বনু নাজিরকে তাড়িয়ে দেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা তো প্রথম থেকেই মদিনার ইয়াহুদি ও মুনাফিকদের সঙ্গে পত্রমারফত মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল। এমনকি এই হুমকিও দিচ্ছিল যে, যদি মুহাম্মাদকে তোমরা সেখান থেকে বের করে না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করব।[১৫৪]

এ সময় ইসলামের বিরোধিতায় তাদের পারস্পরিক কুটিলতা তাদের মধ্যে ঐক্য ও সেতুবন্ধনের কাজ করে। ফলে এ পর্যায়ে মক্কার কুরাইশ, মদিনার ইয়াহুদি ও মুনাফিকদের সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত সব গোত্রের মধ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঐক্যের ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবেই

---

[১৫৪] *সুনানু আবি দাউদ।*

পঞ্চম হিজরির ১০ মুহাররাম জাতুর রিকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এ বছরের রবিউল আউয়ালে দাওমাতুল জানদাল নামে যে যুদ্ধটি হয়, এটিও এই ষড়যন্ত্রের ফল। এরপর ২ শাবান সংঘটিত হয় বনু মুস্তালিকযুদ্ধ। এগুলো ছিল মূলত চরম একটি আঘাতের পূর্বাভাস। গাজওয়ায়ে আহজাবের তোড়জোড় ও রণপ্রস্তুতি এই পূর্বাভাসেরই ফল।

দুই. গাজওয়ায়ে আহজাব বা খন্দকযুদ্ধ

মক্কা থেকে মদিনা সবাই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার দুরভিসন্ধিতে একজোট হয়। পঞ্চম হিজরির জিলকদে সম্মিলিত বাহিনী তাদের সব শক্তি একত্র করে একযোগে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সশস্ত্রবাহিনী পৃথিবীর বুক থেকে মুসলিমদের চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষ্যে মদিনার দিকে এগোয়।

রাসুল ﷺ যখন তাদের এগিয়ে আসার সংবাদ অবগত হন, তখন সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শসভা ডাকেন। সব শুনে সালমান ফারসি রা. তখন খোলা ময়দানে বেরিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না বলে মত প্রকাশ করেন; বরং যেদিক থেকে শত্রুদের মদিনায় প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে, সেদিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। তাঁর এই পরামর্শ গৃহীত হয়। পরামর্শ অনুযায়ী রাসুল ﷺ ৩ হাজার সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে পরিখা খননে লেগে যান। মাত্র ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরিখার কাজ সমাপ্ত হয়। খননকাজে খোদ রাসুলও অংশ নেন।[১৫৫]

পরিখা খননের সময় একবার বিশাল আকৃতির একটি পাথরখণ্ড বের হয়। এটি সরাতে সবাই ব্যর্থ হলে রাসুল ﷺ তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে পাথরটিতে এমন এক আঘাত করেন যে, সেটি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। এভাবেই পরিখা খনন করা হয়।

এদিকে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী এসে মদিনা অবরোধ করে ফেলে। ফলে মুসলমানরা প্রায় ১৫ দিন অবরুদ্ধ থাকেন। এ সময় ইয়াহুদিদের শেষ গোত্র বনু কুরায়জাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ আর ভেতরে বনু কুরায়জার বিদ্রোহ চরম অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে। রসদস্বল্পতার কারণে মুসলমানরা তিন দিন অনাহারে কাটান। সাহাবিরা এ সময় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে নবিজিকে নিজেদের পেট উন্মুক্ত করে দেখান যে, সবাই পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তিনি তখন তাঁর পবিত্র উদর খুলে দেখান যে, তাতে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

[১৫৫] *সিরাতে মুগলতাই : ৫৬।*

অবরোধকারীরা পরিখা পেরোতে না পেরে মুসলিমদের ওপর তির ও পাথর বর্ষণ শুরু করে। উভয় পক্ষেই তখন অনবরত তির-বর্ষণ চলতে থাকে। অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ও শ্বাসরুদ্ধকর ছিল যে, নবিজির চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়।

তিন. কাফিরদের ওপর ঝড়োহাওয়া ও আল্লাহর সাহায্য

অবশেষে সাজসরঞ্জামহীন মুসলিমবাহিনীর তরে মহান আল্লাহর সাহায্য আসে। কাফিরদের ওপর এমন ঝড়োহাওয়া বয়ে যায় যে, তাদের তাঁবুর খুঁটি পর্যন্ত উড়ে যায় এবং চুলায় থাকা ডেগ-ডেকচি উলটে পড়ে। এই ঝড়োহাওয়া কাফিরদের হতবুদ্ধি করে দেয়। অন্যদিকে তাদের রসদও ফুরিয়ে এসেছিল। এ সময় নাইম ইবনু মাসউদ রা. এমন এক কৌশল অবলম্বন করেন, এতে করে কাফিরদের মধ্যে বিভেদ ও ভাঙন সৃষ্টি হয়! পালানো ছাড়া তখন তাদের আর উপায় থাকেনি। ফলে অল্পসময়ে নিদারুণ পরাজয়ের দাগ নিয়ে যুদ্ধের ময়দান খালি করে তারা ফিরে যায়।

চার. এ বছরের বিভিন্ন ঘটনা

- এ বছর হজ ফরজ হয়। অবশ্য হজ ফরজ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।
- জামাদিউল উলায় নবিজির নাতি আবদুল্লাহ ইবনু উসমান অর্থাৎ, নবিকন্য রুকাইয়ার ছেলে আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন।
- এ বছর শাওয়ালের শেষ দিকে আয়েশা রা.-এর মায়ের ইনতিকাল হয়।
- এ বছরের জিলকদে জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. নবিজির সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।
- এ বছরই মদিনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।[১৫৬]

[১৫৬] *সিরাতে মুগলতাই* : ৫৬।
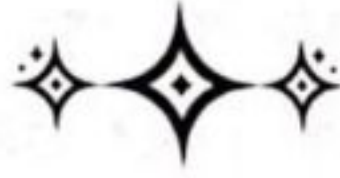
ষষ্ঠ হিজরি

হুদায়বিয়ার সন্ধি, বায়আতে রিজওয়ান এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

এক. হুদায়বিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরির জিলকদে রাসুল ﷺ উমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। তাঁর সঙ্গে ১৪ বা ১৫ শত সাহাবির বিরাট জামাআত মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে এক মঞ্জিল[১৫৭] দূরে একটি কূপের নাম; এর নামানুসারেই এলাকার নামও হুদায়বিয়া। রাসুল ﷺ এখানে যাত্রাবিরতি করেন।[১৫৮]

দুই. নবিজির মুজিজা

সেখানে একটি কূপ একেবারে শুকনো ছিল। নবিজির মুজিজায় সেটি পানিতে ভরে ওঠে। হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর তিনি উসমান রা.-কে কুরাইশদের এ মর্মে অবহিত করতে মক্কায় পাঠান যে, তিনি এবার শুধু বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও উমরা পালনের জন্যই তাশরিফ এনেছেন, এ ছাড়া অন্য কোনো (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য তাঁর নেই।

উসমান রা. মক্কা পৌঁছাতেই কুরাইশ কাফিররা তাঁকে আটক করে ফেলে। এদিকে মুসলিমদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফিররা তাঁকে হত্যা করেছে। নবিজির কাছে যখন এ সংবাদ আসে, তখন তিনি একটি বাবলাগাছের নিচে বসে সাহাবিদের কাছ থেকে জিহাদের বায়আত নেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এটিকে বায়আতে রিজওয়ান বলা হয়।[১৫৯]

পরে জানা যায়, উসমান-হত্যার খবরটি ছিল মিথ্যা; বরং কুরাইশরা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সন্ধির শর্তসমূহ চূড়ান্ত করতে সাহল ইবনু আমরকে পাঠায়। পরে নিম্নোক্ত শর্তগুলো চূড়ান্ত করে অঙ্গীকারপত্র লেখা হয় এবং

---

[১৫৭] ১৬ মাইল বা ২৫.৭৬ কিলোমিটারে এক মনজিল।

[১৫৮] *সিরাতে মুগলতাই।*

[১৫৯] পবিত্র কুরআনের সুরা ফাতহের ১০ নম্বর আয়াতে বায়আতে রিজওয়ানের আলোচনা রয়েছে।

১০ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হয় :

১. মুসলিমরা এবার উমরা না করেই ফিরে যাবেন।

২. আগামী বছর হজ করতে এসে মাত্র তিন দিন থেকে ফিরে যাবেন।

৩. অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসতে পারবেন না। তরবারি সঙ্গে রাখা যাবে, তবে তা কোষবদ্ধ থাকবে।

৪. মক্কা থেকে কোনো মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না।

৫. কোনো মুসলমান যদি মক্কায় চলে আসতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

৬. যদি কেউ মদিনা চলে যায়, তাহলে নবিজি তাকে ফেরত পাঠাবেন।

৭. মদিনা থেকে কেউ মক্কায় চলে এলে কাফিররা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

এসব শর্ত যদিও বাহ্যত মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্যভাবে পরাজয় ও বৈষম্যমূলক ছিল; কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনে একে 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করেন। সাহাবিগণ এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। নবিজি তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলেন, 'আমার প্রতি এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং এতেই আমাদের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ নিহিত।'

পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এ রহস্যের সমাধান করে দেয়—যেমন : সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে মক্কা-মদিনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হয়। কাফিররা নবিজির খিদমতে এবং মুসলিমদের কাছে বিনা বাধায় আসা-যাওয়া করতে থাকে। এদিকে ইসলামি চরিত্রের চুম্বক শক্তি কাফিরদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। ইতিহাসবিদরা বলেন, এ সময় এত অধিক পরিমাণ লোক ইসলামগ্রহণ করে, ইতিপূর্বে কখনো এমন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ সন্ধি ছিল মক্কা-বিজয়েরই ভূমিকা।

তিন. বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে দাওয়াতের পথ মসৃণ হয়। তখন রাসুল ﷺ সত্যের এই আহ্বান গোটা দুনিয়ার শাসকদের কাছে পৌঁছে দিতে মনস্থ করেন। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আমর ইবনু উমাইয়াকে হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশির কাছে পাঠান। আসহামা নবিজির চিঠিটি তাঁর উভয় চোখে রেখে সিংহাসন থেকে নিচে নেমে মাটিতে বসে পড়েন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামগ্রহণ করেন। রাসুল ﷺ-এর যুগেই তিনি ইনতিকাল করেন।

দাহইয়া কালবি রা.-কে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠান। রাসুল ﷺ যে সত্য নবি, তা তিনি অকাট্য প্রমাণাদি ও অতীতের আসমানি গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট

জানতে পেরেছিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলামগ্রহণের ইচ্ছা করেন; কিন্তু এতে তার সকল প্রজা খেপে যায়। তাই তিনি এই চিন্তায় ভীষণ ভয় পেয়ে যান যে, আমি যদি ইসলামগ্রহণ করি, এরা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। এ জন্য তিনি ইসলামগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুজায়ফা রা.-কে পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পাঠান। এই হতভাগা নবিজির চিঠির সঙ্গে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে এবং চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। নবিজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার জন্য বদদুআ করেন—'আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করে দিন, যেভাবে সে আমার চিঠিটি টুকরো টুকরো করেছে।' নবিজির দুআ বিফলে যায়নি। কিছুদিন পরই খসরু পারভেজ তার পুত্র শিরওয়াহর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

এ ছাড়া হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রা.-কে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে পাঠান। আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতা ও মহানবি ﷺ সম্পর্কে বিশ্বাস ঢেলে দিয়েছিলেন। ফলে বাদশাহ মুকাওকিস হাতিব ইবনু আবি বালতাআর সঙ্গে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করেন এবং নবিজির জন্য কিছু উপহারও পাঠান। এর মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামের একজন দাসী এবং দুলদুল নামে সাদা রঙের একটি খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর একজোড়া কাপড়ও ছিল।

আমর ইবনুল আস রা.-কে চিঠিসহ আম্মানের বাদশাহ জাইফার ও আবদুল্লাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠান। তাঁদের উভয়ের অন্তরেও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান আর আসমানি কিতাবাদির মাধ্যমে নবিজির সত্য নবি হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে। পরে তাঁরা উভয়ে মুসলমান হন। তখন থেকেই তাঁরা তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করতে থাকেন এবং আমর ইবনুল আসের হাতে জাকাতের সেসব সম্পদ অর্পণ করেন।

চার. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলামগ্রহণ

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তখন পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখিয়ে আসছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে, বিশেষত উহুদযুদ্ধে তাঁর কারণেই কাফিরদের পিচ্ছিল পা দৃঢ় হয়েছিল। তবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি নিজ থেকেই ইসলামগ্রহণের জন্য মক্কা থেকে মদিনার পথে রওনা দেন। পথিমধ্যে আমর ইবনুল আসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি জানতে পারেন, আমরও ইসলামগ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর করছেন। এরপর তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে মদিনায় নবিজির খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করেন।[১৬০]

---

[১৬০] *আল-ইসাবাহ*, হাফিজ ইবনু হাজার আসাকালানি রাহ.।

সপ্তম হিজরি

খায়বারযুদ্ধ, ফাদাক বিজয় এবং কাজা উমরা আদায়

এক. গাজওয়ায়ে খায়বার বা খায়বারযুদ্ধ

মদিনার ইয়াহুদিদের মধ্যে বনু নাজির সম্প্রদায় যখন খায়বারে[১৬১] গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তখন খায়বার ইয়াহুদিদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। সেখান থেকেই তারা পুরো আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত।

তাদের শায়েস্তা করতে সপ্তম হিজরির মুহাররাম বা জামাদিউল উলায় রাসুল ﷺ ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী সেনার বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য খায়বারে উপস্থিত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই এবং ব্যাপক হতাহত হয়। শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন এবং ইয়াহুদিদের সব দুর্গ তখন মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

খায়বারের এই যুদ্ধে আলি রা. বিশেষ রণনৈপুণ্য দেখান। তিনি একাই হাত দিয়ে খায়বারের দুর্গফটক উপড়ে ফেলে দেন; অথচ ফটকটি একসঙ্গে ৭০ জন লোকও নাড়াতে পারত না। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আলি রা. যুদ্ধে এই ফটকটি হাতের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[১৬২]

দুই. ফাদাক বিজয়

খায়বার বিজয়ের পর নবিজি ﷺ ফাদাকের ইয়াহুদিদের প্রতি ছোট একটি বাহিনী পাঠান। ইয়াহুদিরা তখন মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি করে করে নেয়।

---

[১৬১] খায়বার মদিনা থেকে শাম দিকে তিন-চার মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর। *জুরকানি* : ২/২১৭।

[১৬২] *জুরকানি।* (তবে বর্ণনাটি ইতিহাসের অনেক গ্রন্থে পাওয়া গেলেও কেউ কেউ এটি বিশুদ্ধ নয় বলে মত দিয়েছেন।)

তিন. কাজা উমরা আদায়

গত বছর (ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে উমরা আদায় করা সম্ভব হয়নি এবং কুরাইশ কাফিরদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, 'মুসলিমরা আগামী বছর উমরা আদায় করবে এবং তিন দিনের বেশি সময় মক্কায় থাকবেন না।' এ বছর সেই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন এবং চুক্তির সব শর্ত মেনে উমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অষ্টম হিজরি

সারিয়ায়ে মুতা, মক্কাবিজয়, হুনাইন ও তায়েফযুদ্ধ এবং উমরায়ে জিইররানা

এক. সারিয়ায়ে মুতা

মুতা[১৬৩] অঞ্চলটি শামের বালকা শহরের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা। বায়তুল মাকদিস থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরে। এখানেই মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধের কারণ ছিল, রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষ থেকে শামের বালকায় নিযুক্ত বসরার গভর্নর ছিল আমর ইবনু শুরাহবিল। সে নবিজির দূত হারিস ইবনু উমায়ের রা.-কে হত্যা করে। আর দূত হত্যা ছিল তখনকার রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। ফলে মুসলিমদের যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

নবিজি ﷺ যখন হারিস ইবনু উমায়েরের শহিদ হওয়ার সংবাদ পান, তখন জায়েদ ইবনু হারিসার নেতৃত্বে ৩ হাজার সেনার এক বাহিনী তার বিরুদ্ধে পাঠান। জায়েদের বাহিনী যখন মুতা অঞ্চলে পৌঁছায়, তখন রোমানরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে তারা দেড় লাখ সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে।

কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর আল্লাহ তাআলা দেড় লাখ কাফিরের বিশাল বাহিনীর অন্তরে মাত্র ৩ হাজার মুসলিমের এমন ভীতি সঞ্চার করেন যে, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় তারা খুঁজে পায়নি।

দুই. মক্কাবিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত লেখা ছিল, মুসলিমরা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলো পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছিলেন। কিন্তু অষ্টম

[১৬৩] 'মুতা' জর্দানের বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এই জায়গা থেকে বায়তুল মাকদিসের দূরত্ব মাত্র দুই মনজিল। এখানেই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

হিজরিতে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। রাসুল ﷺ একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে তখন কয়েকটি শর্ত দেন এবং শেষের দিকে লিখে দেন যে, এ শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে হুদাবিয়ার সন্ধি ভেঙে গেছে বলে মনে করতে হবে। ফলে কুরাইশরা সন্ধিভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করে।

এরপর রাসুল ﷺ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অষ্টম হিজরির ১০ রমজান মঙ্গলবার আসরের নামাজের পর ১০ হাজার সাহাবির বিশাল এক বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। তারপর 'কুদায়বিয়া' নামক স্থানে মাগরিবের সময় হলে সবাই সেখানে ইফতার করেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে মুসলিমবাহিনীর একটি অংশসহ উপর দিকের রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য পাঠান। তাঁদের এটাও বলে দেন যে, 'কেউ তোমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়ালে তোমরাও তরবারি উন্মুক্ত করবে না।'

এদিকে রাসুল ﷺ নিজে অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দেন—'যে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে-ও নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে-ও নিরাপদ।' অবশ্য তিনি ১১ জন পুরুষ আর চারজন মহিলার রক্ত ক্ষমা করেননি। কারণ, তাদের অস্তিত্বই ছিল যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মূল। কিন্তু তারা সবাই এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাদের অধিকাংশই মক্কাবিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে ইসলামগ্রহণ করে।

২০ রমজান শুক্রবার রাসুল ﷺ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তখন পর্যন্ত কাবার আশপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি বিদ্যমান ছিল। এ সময় নবিজির হাতে একটি কাঠের টুকরো ছিল। তিনি যখন একটি মূর্তির পাশ দিয়ে যেতেন, তখনই কাঠ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করতেন আর মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

> সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।
> [সুরা বনি ইসরাইল : ৮১]

তিন. মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ

তাওয়াফ সমাপ্ত করে রাসুল ﷺ কাবা শরিফের চাবিরক্ষক উসমান ইবনু তালহা শাইবির কাছ থেকে কাবার চাবি নিয়ে কাবার ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে মাকামে ইবরাহিমে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি মসজিদে তাশরিফ নেন।

এদিকে লোকজন গভীর উৎকণ্ঠায় এ অপেক্ষা করছিল যে, রাসুল ﷺ কুরাইশদের ব্যাপারে আজ কী নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু সব দ্বিধা, সংশয় আর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বনবি ﷺ কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমারা সব দিক থেকে স্বাধীন ও নিরাপদ!' তারপর তিনি কাবাঘরের চাবিও তাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেন।[১৬৪]

চার. নবিজির চরিত্রমাহাত্ম্য ও আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ

আবু সুফিয়ান—যিনি নবিজির বিরুদ্ধে কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন এবং তাদের পরিচালিত প্রায় সব যুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করে আসছিলেন—মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে গোপনে মুসলিমবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ করতে তিনি মক্কা থেকে বেরোলে সাহাবিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বন্দি অবস্থায় তাঁকে রহমতে আলম নবিজির খিদমতে আনা হলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। নবিজির মহত্ত্ব ও উদারতার ফলে আবু সুফিয়ান তখনই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। ফলে আজ তাঁর নামের সঙ্গে 'রাজিআল্লাহু আনহু' উচ্চারণ করা হয়।

মক্কাবিজয়ের দিন একব্যক্তি ভীত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নবিজির দরবারে উপস্থিত হয়। করুণার নবি ﷺ তাকে বলেন, 'শান্ত হও, আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই, আমি তো একজন সাধারণ মায়ের সন্তান।'

মক্কাবিজয়ের পর ১৫ দিন[১৬৫] রাসুল ﷺ সেখানে অবস্থান করেন।

এ সময় মদিনার আনসাররা এ কথা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, এখন হয়তো রাসুল মক্কায় থেকে যাবেন; আর আমরা তাঁর থেকে দূরে থেকে যাব। কিন্তু রাসুল ﷺ যখন তাঁদের এই সংশয় আঁচ করতে পারেন, তখন বলেন, 'এখন তো আমার জীবন-মরণ তোমাদেরই সঙ্গে জড়িত।'

এরপর রাসুল ﷺ আত্তাব ইবনু উসায়েদকে মক্কার গভর্নর মনোনীত করে মদিনার উদ্দেশে রওনা হন।

পাঁচ. হুনাইনযুদ্ধ

মক্কাবিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের লোকেরা বিপুলসংখ্যায় ইসলামগ্রহণ করতে থাকে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃশ্চিন্ত হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের ভয়ে ইসলামগ্রহণে দেরি করছিলেন এবং

---

[১৬৪] *তালখিসুস সিরাত।*

[১৬৫] *সিরাতে মুগলতাই।* সহিহ বুখারির সপ্তম পৃষ্ঠার বর্ণায় আরও কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

মক্কাবিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। এখন তাঁদের সবাই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেন। বাকি আরবদের তখন এমন শক্তি বা সাহস ছিল না যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র দুটি নিজেদের আত্মসম্মানবোধ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মক্কার দিকে এগোয়।

রাসুল ﷺ এ ব্যাপারে অবগত হয়ে ১২ হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেন। এঁদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন আনসার ও মুহাজির, যাঁরা মক্কাবিজয়ের সময় মদিনা থেকে নবিজির সঙ্গে ছিলেন, আর ২ হাজার ছিলেন নওমুসলিম, যাঁরা মক্কাবিজয়ের সময় ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। এ সংখ্যাটি তখন পর্যন্ত মুসলিমবাহিনীর সবচেয়ে বড় সংখ্যা ছিল।

অষ্টম হিজরির ৬ শাওয়াল আল্লাহর এ বাহিনী রওনা হয়। তাঁরা যখন হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছান, তখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে আত্মগোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে বসে। যেহেতু তখনো সেনাদের সারিবিন্যাসই সম্পন্ন হয়নি, তাই মুসলিমবাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটা শুরু করে।

এই পিছু হটার বাহ্যিক কারণ সারিবিন্যাসের অপূর্ণতা আর মক্কার নওমুসলিমদের ভয় বলা হলেও প্রকৃত কারণের ইঙ্গিত পবিত্র কুরআনে এভাবে রয়েছে যে—অর্থাৎ, মুসলিমরা তখন নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজসরঞ্জাম দেখে গর্ববোধ করছিলেন। কোনো কোনো সাহাবি, এমনকি আবু বকর রা.-এর মতো ব্যক্তির মুখ থেকে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছিল যে, 'আজ আমরা পরাজিত হতে পারি না।' এ জন্য আল্লাহ তাঁদের সতর্ক করতে এ ব্যবস্থা নেন, যেন মুসলিমরা বুঝতে পারেন, জয়-পরাজয় আমাদের হাতে নয় এবং এটা তির-তরবারির ওপরও নির্ভরশীল নয়। বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয়; আর হুনাইনযুদ্ধে এত বিপুল সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পরাজয়ের এটাই সেই নিগূঢ় রহস্য।

রাসুল ﷺ তখন দুটি বর্ম পরে দুলদুলে বসা ছিলেন। নিজের বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে তাঁর নির্দেশে আব্বাস রা. মুসলিমদের এক বীরত্বপূর্ণ আওয়াজ দ্বারা দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। এতে নড়বড়ে ও টালমাটাল বাহিনী পুনরায় সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়।

ছয়. একমুঠো মাটি দ্বারা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করা

এদিকে রাসুল ﷺ একমুঠো মাটি নিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর

কুদরতে এই একমুঠো মাটি শত্রুবাহিনীর প্রত্যেক সেনার চোখে গিয়ে পড়ে। এমনকি একটি সেনাও তা থেকে রক্ষা পায়নি।[১৬৬] শেষপর্যন্ত শত্রুবাহিনী ভীত হয়ে পালায় এবং পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে মাত্র চারজন এবং ৭০ জনের চেয়ে বেশি শত্রুসেনা নিহত হয়। মুসলমানরা তখন প্রতিশোধস্পৃহায় শিশু ও মহিলাদের প্রতি আক্রমণে উদ্যত হলে রাসুল ﷺ তাঁদের এ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

সাত. তায়েফযুদ্ধ

এরপর রাসুল ﷺ তায়েফের দিকে দৃষ্টি দেন। তায়েফ ছিল বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াজিনের কেন্দ্র। প্রায় ১৮ দিন তাদের অবরুদ্ধ রাখার পরও বিজয় অর্জিত হয়নি। ফলে অবরোধ তুলে ফেরার সময় জিইররানা নামক স্থানে যখন পৌঁছান, তখন তায়েফের হাওয়াজিনের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে আবেদন করে, হুনাইনযুদ্ধে মুসলিমদের হাতে তাদের যে-সকল লোক বন্দি রয়েছে, তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। নবিজি ﷺ তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বন্দিদের মুক্ত করেন। এরপর তিনি যখন তায়েফ থেকে মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তায়েফের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করে।[১৬৭]

আট. উমরায়ে জিইররানা

যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে জিইরিরানা নামক স্থানে অবস্থানের সময় রাসুল ﷺ উমরা পালনের ইচ্ছা করেন। ফলে এখান থেকেই ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছান। এরপর উমরা আদায় করে মদিনার উদ্দেশে রওনা দেন। অষ্টম হিজরির ৬ জিলকদ তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।

[১৬৬] *সিরাতে মুগলতাই* : ৬৭।

[১৬৭] প্রাগুক্ত : ৭২।

নবম হিজরি

তাবুকযুদ্ধ, ইসলামি হজ, বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামগ্রহণ

এক. গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুকযুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরির মাঝামাঝি পর্যন্ত রাসুল ﷺ মদিনায় অবস্থায় করেন। এ সময় তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, মুতার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা পুনরায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাবুকে[১৬৮] সেনাসমাবেশ করে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেছে। রোমানদের রণপ্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে রাসুল ﷺ-ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু সময়টা ছিল বেশ কঠিন। দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলিমরা অভাব-অনটনে দিয়ে দিন পার করছিলেন। এ ছাড়া তখন প্রচণ্ড গরম ছিল। কিন্তু সাহাবিরা তো ছিলেন দীনের প্রতি আত্মোৎসর্গকারী মহান কাফেলা। তাঁরা এতসব বিপদের পরও দীনের সাহায্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এবারই প্রথম যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। নবিজির আবেদনে সাহাবিরা প্রাণ উজাড় করে অর্থসম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করেন। আবু বকর রা. ঘরের সব জিনিসপত্র নবিজির খিদমতে পেশ করেন। উসমান রা. যুদ্ধ-তহবিলে বড় ধরনের সাহায্য করেন। তাতে ৯০০ উট এবং ১০০ ঘোড়া ছিল।[১৬৯]

এরপর রজবের বৃহস্পতিবার ৩০ হাজার সাহাবির এক বিশাল কাফেলা নিয়ে রাসুল ﷺ তাবুকের দিকে রওনা দেন।

দুই. কয়েকটি মুজিজা

ক. তাবুক যাওয়ার পথে নবিজি ﷺ আবু জার গিফারিকে দেখতে পান, তিনি একাকী

---

[১৬৮] তাবুক মদিনা ও দামেশকের (সিরিয়া) মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। মদিনা থেকে এটি ৬৯০ এবং সিরিয়ার রাজধানী দামেশক থেকে ৬৯২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

[১৬৯] *সিরাতে মুগলতাই* : ৭৬।

পথ চলছেন। এটা দেখে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, 'সে দুনিয়ায় একাকী চলবে, একাকী জীবন কাটাবে এবং একাকী মৃত্যুবরণ করবে।' বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল।

খ. এ যুদ্ধসফরেই নবিজির উটনী হারিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা জিবরিলের মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন যে, উটনীর লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকে আছে। পরে সেখানে গিয়ে উটনীকে এ অবস্থায়ই পাওয়া যায়।

গ. মুসলমানগণ যখন তাবুকে পৌঁছান, তখন সেখানে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে হিমসে চলে যায়। নবিজি তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে উকাইদির নামের খ্রিস্টান পাদরির কাছে পাঠান এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, 'তোমরা রাতে তার সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তখন শিকারে ব্যস্ত থাকবে।' খালিদ সেখানে পৌঁছে তাকে এ অবস্থায়ই দেখতে পান এবং তাকে বন্দি করে নিয়ে আসেন।

নবিজি তাবুকে প্রায় ১৫-২০ দিন অবস্থান করেন; কিন্তু কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে আসেনি। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি তাবুক থেকে ফিরে আসেন। এটাই ছিল নবিজির শেষ গাজওয়া বা যুদ্ধাভিযান। নবম হিজরির রমজানে তিনি বাহিনী নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

তিন. মসজিদে জিরারে অগ্নিসংযোগ

তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর রাসুল ﷺ সে জায়গাটি আগুন লাগিয়ে ধ্বংসের নির্দেশ দেন, যেটি মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরামর্শের জন্য তৈরি করেছিল এবং মুসলিমদের ধোঁকা দিতে এর নাম দিয়েছিল 'মসজিদ'।[১৭০]

এর মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, সেটি আদৌ কোনো মসজিদ ছিল না; বরং মুসলিমদের ক্ষতির উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল।

চার. প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামে প্রবেশ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সর্বত্র যখন শান্তি ও নিরাপত্তা-পরিস্থিতি বিরাজ করে, সার্বিক পরিস্থিতি যখন অনুকূলে চলে আসে, তখন ইসলামের প্রচার-প্রসার আরও বিস্তৃত আঙ্গিকে শুরু হয়। এ জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আসমানি দপ্তরে (আল্লাহর কাছে) বিজয় গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও কিছু মানুষ কাফির কুরাইশদের ভয়ে ইসলামগ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাঁদের জন্য মক্কাবিজয় সেই বাধাও দূর করে দেয়। ফলে তখন

[১৭০] *সিরাতে মুগলতাই* : ৭৬।

থেকেই সমগ্র আরবে পবিত্র কুরআন তার নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়ায়—একসময় যাঁরা ইসলাম ও মুসলিমদের চেহারাও দেখতে চাইতেন না, আজ তাঁরাই দলে দলে নবিজির খিদমতে আসতে থাকে এবং স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করে নিজেদের জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এসব প্রতিনিধিদলের অধিকাংশই নবম হিজরিতে নবিজির খিদমতে উপস্থিত হয়।

১. বনু সাকিফের প্রতিনিধিদল

তাবুকযুদ্ধের পর বনু সাকিফের প্রতিনিধিদল মদিনায় নবিজির খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করে।

এরপর ধারাবহিকভাবে প্রতিনিধিদলের আগমন শুরু হয়। এসব প্রতিনিধিদলের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়।[১৭১] তন্মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো :

২. বনু ফাজারার প্রতিনিধিদল

এই গোত্রের লোকেরা মদিনায় আসার আগেই ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা প্রতিনিধিদল হিসেবে মদিনায় নবিজির খিদমতে উপস্থিত হন।

৩. বনু তামিমের প্রতিনিধিদল

বনু তামিমের প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৪. বনু সাআদ ইবনু বকরের প্রতিনিধিদল

এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন জিমাম ইবনু সালাবা। তিনি নবিজিকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। রাসুল ﷺ তাঁর সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর অন্তর থেকে যখন সব দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তখন তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর আপন গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচার করতে থাকেন। ফলে একপর্যায়ে তাঁর গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৫. কিন্দার প্রতিনিধিদল

পবিত্র কুরআনের সুরা সাফফাতের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত শুনেই এই প্রতিনিধিদলের অন্তরে ইসলাম ঠাঁই করে নেয়। তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

---

[১৭১] হাফিজ মুগলতাই রাহ. তাদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় বর্ণনা করেছেন। সিরাতে মুগলতাই : ৭৭।

৬. বনু আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল

এই গোত্রের সবাই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। এরপর তাঁরা নবিজির খিদমতে এসে মুসলমান হন। তিনি এ সময় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি তাঁদের শিক্ষা দেন।

৭. বনু হানিফের প্রতিনিধিদল

এই গোত্রের প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে মুসলমান হয়। তাদের মধ্যে মুসায়লিমাও ছিল। সে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির কারণে 'মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব' নামে কুখ্যাতি লাভ করে। আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে তার সকল অনুসারীসহ সাহাবিদের হাতে নিহত হয়।

শিক্ষণীয়, মুসায়লিমা যখন নবুওয়াতের দাবি করে, তখন সে রাসুল ﷺ, কুরআন ও ইসলামকে অস্বীকার করেনি।[১৭২] এ প্রসঙ্গে হাদিস ও তাফসিরশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম শায়খ আবু জাফর তাবারি রাহ. তাঁর *আত-তারিখ* গ্রন্থে লেখেন, 'মুসায়লিমা তার মুআজ্জিনকে আজানের মধ্যে সবসময় 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' বলার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর যেহেতু কোনো প্রকার নবুওয়াতের দাবি করা অবৈধ; বরং সাধারণভাবে নবুওয়াতের দাবি করা কুরআনের অসংখ্য আয়াত, মুতাওয়াতির হাদিস এবং উম্মাহর ঐকমত্যে খতমে নবুওয়াতের সর্বসম্মত আকিদাকে অস্বীকার করা হয়, এ জন্য সাহাবিরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মুসায়লিমা যে শরিয়তহীন নবুওয়াতের দাবি করছে, তা কুফরি এবং দীন ছেড়ে মুরতাদ হওয়ার নামান্তর। ফলে তাঁরা সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আজান, নামাজ, তিলাওয়াত এসব কাজ বহাল রাখলেও তাকে কাফির-মুরতাদ বলা থেকে তাঁদের বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির দাবি মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবের চেয়েও মারাত্মক। সে নিজেকে সকল নবি থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং অনেক নবি সম্পর্কে এমন পীড়াদায়ক ও অপমানজনক মন্তব্য করেছে, যা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে সে ইসা আ. সম্পর্কে এমনসব অপবাদ আরোপ করেছে এবং নোংরা ভাষায় গালাগাল করেছে যে, কোনো মুসলমান তা শুনে ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না।[১৭৩]

---

[১৭২] এমনকি সে নিজেকে স্বতন্ত্র শরিয়তপ্রবর্তক নবি বলেও দাবি করত না; বরং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মতো শরিয়তহীন এবং নিজেকে শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অধীন নবি বলে দাবি করত।

[১৭৩] কাদিয়ানির লিখিত *জামিমায়ে আনজাম, দাফিউল বালা, নুজুলুল মাসিহ* পাঠ করে যে কেউ যাচাই করতে পারেন। এগুলো ছাড়া তার আরও অনেক শিরকি আকিদা ও দাবি রয়েছে, সেগুলো দেখে যদি সব ইসলামি

৮. বনু কাহতানের প্রতিনিধিদল

এই গোত্রের নেতা ছিলেন জায়েদ আল খায়ল। তাঁরা নবিজির খিদমতে এসে সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৯. বনু হারিসের প্রতিনিধিদল

এই প্রতিনিধিদলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়ে মুসলমান হয়ে যান।[১৭৪]

এভাবে বনু আসআদ, বনু মুহারিব, হামদান, গাসসান ইত্যাদি গোত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ নবিজির খিদমতে আসার আগে; আবার কেউ কেউ এসে ইসলামগ্রহণ করেন। হিমইয়ারের বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের নিজ নিজ গোত্রের বাদশাহ মনে করা হতো। তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এসে নবিজিকে সংবাদ দেন যে, তাঁরা সবাই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেছেন।

এভাবে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করতে থাকে। ফলে দশম হিজরির বিদায়হজের সময় ১ লাখের বেশি মুসলমান নবিজির সঙ্গে হজ আদায় করতে যান। এ ছাড়া অনুপস্থিতদের সংখ্যা তখন এরচেয়ে অনেক বেশি ছিল।

পাঁচ. আবু বকরকে হজের আমির নির্ধারণ

তাবুকযুদ্ধের পর নবম হিজরির জিলকদে নবিজি ﷺ আবু বকর রা.-কে হজের আমির নির্ধারণ করে মক্কায় পাঠান।

দল ও মতের আলিমরা সম্মিলিতভাবে তাকে কাফির ফাতওয়া দেন এবং তার নামাজ, রোজা ও স্বরচিত ধর্ম নিয়ে উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন, তাহলে নিশ্চয় সেটা সাহাবিদের আদর্শের অনুসরণ হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো সমালোচনা করা যাবে না।

[১৭৪] এই আলোচনায় বোঝা যায়, খালিদ রা. নবম হিজরিতে মুসলমান হন; কিন্তু এ গ্রন্থেই ষষ্ঠ হিজরির আলোচনায় রয়েছে যে, তিনি ও আমর ইবনুল আস রা. ষষ্ঠ হিজরিতে মুসলমান হন। বস্তুত, উভয় আলোচনাই সঠিক। খালিদ রা. আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরে দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকেন। এদিকে নবম হিজরিতে বনু হারিসের লোকদের দাওয়াত দিলে তারা ইসলামগ্রহণে সম্মত হয়। তখন নবিজির নির্দেশে বনু হারিসের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে তিনি নবিজির কাছে উপস্থিত হন এবং সে গোত্রের সবাই ইসলামগ্রহণ করেন। —অনুবাদক।

দশম হিজরি

বিদায়হজ ও আরাফাতের ঐতিহাসিক ভাষণ

এক. হুজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায়হজ

১০ হিজরির ২৫ জিলকদ সোমবার রাসুল ﷺ হজ করতে মক্কার উদ্দেশে রওনা দেন। সাহাবিদের বিশাল জামাআত তাঁর সফরসঙ্গী হন, যাঁদের সংখ্যা ১ লাখের চেয়ে বেশি ছিল। মদিনা থেকে ছয় মাইল দূরে জুলহুলাইফায় তাঁরা হজের জন্য ইহরাম বাঁধেন। এরপর ৪ জিলহজ সোমবার মক্কায় প্রবেশ করে হজের কার্যাবলি সম্পন্ন করেন।

দুই. আরাফাতের খুতবা বা বিদায়হজের ভাষণ

৯ জিলহজ রাসুল ﷺ আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে উপস্থিত হন এবং অত্যন্ত নাতিদীর্ঘ ও সাহিত্যালংকারপূর্ণ এক ভাষণ দেন, যে ভাষণ মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের নীতিমালা ও উপদেশে ভরপুর ছিল। এটাই ছিল নবিজির শেষ ভাষণ। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে গেঁথে রাখা জরুরি। নবিজি বলেন,

> লোকসকল, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, যাতে আমি তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় বর্ণনা করতে পারি। আমি জানি না। আগামী বছর আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব কি না।

নবিজি আরও বলেন,

> মুসলিমদের জানমাল, ইজ্জত-সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত এমনভাবে পবিত্র ও সম্মানিত, যেভাবে আজকের এ দিন (আরাফাতের দিন), এ মাস (জিলহজ মাস) এবং এ শহর (পবিত্র মক্কা) তোমাদের কাছে পবিত্র-সম্মানিত। এ জন্য কারও কাছে যদি অন্য কারও আমানত থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা আদায় করতে হবে।

তিনি আরও বলেন,

> হে লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের ওপর কিছু অধিকার রয়েছে, যেভাবে স্ত্রীদের ওপর তোমাদের কিছু আধিকার রয়েছে। সকল মুসলমান একে অপরের ভাই। কারও জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া নেওয়া বৈধ নয়।
>
> আমার পরে তোমরা আবারও কাফির হয়ে যেয়ো না। একে অপরকে হত্যা করো না। আমার অবর্তমানে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি কুরআনের যাবতীয় বিধান শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

নবিজি আরও বলেন,

> হে লোকসকল, তোমাদের রব একজন, তোমাদের আদি পিতা একজন; তোমরা সবাই আদম আ.-এর সন্তান; আর আদম আ. মাটির সৃষ্টি। তোমাদের সে-ই সবচেয়ে অধিক সম্মানী, যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। (মনে রেখো,) কোনো আরব খোদাভীতি ছাড়া কোনো অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।
>
> স্মরণ রেখো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তাঁদের কাছে আপনার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। তোমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অনুপস্থিতদের মধ্যে এসব কথা পৌঁছে দেওয়া।

হজ শেষে রাসুল ﷺ আরও ১০ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এরপর মদিনায় ফিরে আসেন।

একাদশ হিজরি

সারিয়ায়ে উসামা, নবিজির অসুস্থতা ও ইনতিকাল

এক. সারিয়ায়ে উসামা ইবনু জায়েদ

মক্কা থেকে ফিরে আসার পর ১১ হিজরির ২৬ সফর সোমবার রাসুল ﷺ রোমানদের মোকাবিলার জন্য একটি সারিয়া বা বাহিনী তৈরি করেন। এ বাহিনীতে আবু বকর, উমর ও আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-এর মতো বড় বড় সাহাবি যুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই অভিযানের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় উসামা রা.-এর হাতে। এটিই ছিল শেষ যুদ্ধাভিযান, যার সব ব্যবস্থাপনা খোদ রাসুল ﷺ আনজাম দেন। তবে বাহিনী রওনার আগে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। ফলে সাময়িকভাবে অভিযান মুলতুবি করা হয়। তাঁর ইনতিকালের পর আবু বকর রা. খলিফা হলে তিনি নবিজির আদেশমতো বাহিনী পাঠান।

দুই. নবিজির অসুস্থতা, অন্তিমশয্যা ও ইনতিকাল

১১ হিজরির ২৮ সফর বুধবার রাতে নবিজি ﷺ 'বাকিয়ে গারকাদ' কবরস্থান জিয়ারতে যান এবং কবরবাসীদের জন্য দুআ করেন। দুআয় তিনি বলেন, 'কবরবাসীরা, তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কবরের অবস্থান কল্যাণকর হোক। কেননা, পৃথিবী এখন থেকে ফিতনার আঁধারে ছেয়ে যাবে।'

জিয়ারত শেষে ফেরার পর নবিজির মাথাব্যাথা শুরু হয়। এরপর জ্বরও চলে আসে।[১৭৫] বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী এই জ্বর ১৩ দিন স্থায়ী ছিল এবং এ অসুস্থতায় তিনি ইনতিকাল করেন।[১৭৬] অসুস্থতার এ সময়ে তিনি প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদের ঘরে যাতায়াত করেন। তবে অসুস্থতা যখন বেড়ে যায়, তখন স্ত্রীদের কাছ থেকে এভাবে অনুমতি নেন যে, অসুস্থতার দিনগুলো তিনি আয়েশা রা.-এর ঘরে থাকতে চান। ফলে সবাই তাঁকে অনুমতি দেন এবং তিনি আয়েশার ঘরে অবস্থান করতে থাকেন।

---

[১৭৫] *সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৪২২।*

[১৭৬] *ফাতহুল বারি, হিন্দি : ১৮/৯৮।*

তিন. আবু বকরের ইমামতি

নবিজির অসুখ ক্রমেই বাড়ছিল এবং একপর্যায়ে মসজিদেও যেতে পারছিলেন না। সে সময় তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দেন। আবু বকর নবিজির জীবদ্দশায় প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন।[১৭৭] ঘটনাক্রমে একদিন আবু বকর ও আব্বাস রা. আনসার সাহাবিদের এক বৈঠকের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা দেখতে পান উপস্থিত সবাই কাঁদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, 'আমরা নবিজির মজলিসের কথা স্মরণ করে কাঁদছি।' আব্বাস তাঁদের এই অবস্থার কথা নবিজিকে জানান। তিনি তখন আলি ও ফাজল ইবনু আব্বাস রা.-এর কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বের হন। আব্বাস তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন। নবিজি মিম্বারে উঠতে চাইলেও অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেননি; প্রথম সিঁড়িতে বসে পড়েন। এ সময় তিনি উপস্থিত সাহাবিদের সামনে অলংকারপূর্ণ এক ভাষণ দেন।

চার. শেষ নবির শেষ ভাষণ

> হে লোকসকল, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা তোমাদের নবির মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় করছ। তোমাদের জানা থাকা চাই, আমার আগে কোনো নবি কি চিরকাল থেকেছেন যে, আমিও থাকব? হ্যাঁ, আমি আমার মহান রবের সঙ্গে শীঘ্রই মিলতে যাচ্ছি এবং তোমরাও আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তবে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলনের স্থান হচ্ছে হাউজে কাউসার। অতএব, যে এটা পছন্দ করে যে, কিয়ামত-দিবসে সে হাউজে কাউসারের পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, সে যেন আপন হাত ও মুখকে অনর্থক কাজ ও অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত রাখে। আমি তোমাদেরকে তোমাদের মুহাজির ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং মুহাজিররা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা ও সদাচরণের অসিয়ত করছি।

নবিজি আরও বলেন,

> মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে। আর যখন তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করে।[১৭৮]

সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এই ভাষণ প্রদানের পর রাসুল ﷺ ঘরে ফিরে আসেন। ইনতিকালের পাঁচ অথবা তিন দিন আগে আবারও তিনি ঘরের বাইরে বের হন। তখন

---

[১৭৭] *মিরকাত শরহে মিশকাত*, আবওয়াবুল ইমামত।

[১৭৮] *দুরুসুস সিরাতিল মুহাম্মাদিয়া।*

তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। মসজিদে তখন আবু বকর রা. জুহরের[১৭৯] নামাজের ইমামতি করছিলেন। নবিজির আগমন টের পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে থাকলে তিনি তাঁকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর তিনি আবু বকরের বাম পাশে বসে পড়েন।[১৮০] নামাজ শেষ হলে মুসল্লিদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন,

> আমার প্রতি আবু বকরের অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমার খলিল (বন্ধু) বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম; কিন্তু আল্লাহ ছাড়া যেহেতু আমার কোনো খলিল হতে পারেন না, তাই আবু বকর আমার ভাই ও বন্ধু।

নবিজি আরও বলেন, 'আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদে আর যত দরজা রয়েছে, সব বন্ধ করে দাও।'

আল্লামা ইবনু হিব্বান রাহ. এ হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'এ হাদিসে স্পষ্টভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবিজির পর আবু বকরই খলিফা হবেন।'[১৮১]

২ রবিউল আউয়াল সোমবার।[১৮২] সে দিন আবু বকরের ইমামতিতে লোকেরা ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে রাসুল ﷺ আয়েশা রা.-এর কক্ষের পর্দা সরিয়ে লোকদের নামাজ পড়তে দেখে মুচকি হাসেন। আবু বকর রা. বিষয়টি টের পেয়ে পেছনে সরে আসতে লাগলেন। তখন আনন্দের আতিশয্যে সাহাবিদের মনও নামাজের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। জনৈক কবি বলেন,

নামাজে নত হলেই তোমার চেহারা ভেসে ওঠে হৃদয়পটে
মিহরাব তখন এগিয়ে এসে আমার সাথে কথা বলে।

এ অবস্থা দেখে নবিজি হাতের ইশারায় নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর তিনি

---

১৭৯ *ফাতহুল বারি, হিন্দি* : ১৮/১০৬।

১৮০ বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় রাসুল ﷺ ইমাম ছিলেন। আবু বকরসহ সকল মুসল্লি নবিজির ইকতিদা করেন। অবশ্য আবু বকর রা. উচ্চৈঃস্বরে তাকবির দিচ্ছিলেন। *মিশকাত।*

১৮১ *ফাতহুল বারি* : ১৪/৩৫৬।

১৮২ প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী রাসুল ﷺ ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার ইনতিকাল করেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এমনটাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী এটা সঠিক নয়। তবে এটা সর্বজন স্বীকৃত এবং নিশ্চিত যে, ৯ জিলহজ শুক্রবার রাসুল ﷺ তাঁর জীবনের শেষ হজ আদায় করেছেন। এ দুটি বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার হয় না। এ কারণে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. *সহিহ বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেছেন যে, নবিজির ইনতিকালের সঠিক তারিখ হচ্ছে ২ রবিউল আউয়াল। লেখকের ভুলে ২ এর স্থলে ১২ লেখা হয়েছে এবং আরবি ইবারতে ثاني شهر ربيع الاول এর স্থলে ثاني عشر ربيع الاول হয়ে গেছে। হাফিজ মুগলতাই রাহ.-ও ২ রবিউল আউয়ালের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পর্দা ফেলে ঘরের ভেতরে চলে যান। এ ঘটনার পর তিনি আর কখনো বাইরে বের হননি। সে দিন জুহরের নামাজের পর নবিজি ﷺ দুনিয়ার এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রাফিকে আলার সঙ্গো মিলিত হন। *সহিহ বুখারির* বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।[১৮৩]

পাঁচ. নবিজির শেষ কথা

আয়েশা রা. বলেন, অসুস্থতার সময় নবিজি ﷺ কখনো কখনো চেহারা মুবারক থেকে চাদর সরিয়ে বলতেন, 'ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ এ জন্য এসেছে যে, তারা তাদের নবিদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে।' এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমরা যেন এ কাজ থেকে বিরত থাকে।[১৮৪]

আফসোস! রাসুল ﷺ তাঁর জীবনের অন্তিমশয্যায় যেসব বিষয়ের ভয় করছিলেন, সেসব কাজ থেকে মুসলিমরা বিরত থাকেনি। অলি ও নেক বান্দাদের কবরসমূহকে তারা সিজদার স্থান বানিয়েছে।

আয়েশা রা. বলেন, 'মৃত্যুশয্যায় নবিজি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, اَللّٰهُمَّ رَفِيْقَ الْأَعْلٰى। অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুকে পছন্দ করি।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে اَلصَّلَاةُ اَلصَّلَاةُ। শব্দগুলো উচ্চারিত হতো।[১৮৫] যতক্ষণ তাঁর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, ততক্ষণ এ শব্দগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল।[১৮৬]

নবিজির ইনতিকালের সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাহাবিদের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরা নবিজির মৃত্যুসংবাদ আদৌ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উমরের মতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আর শক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি শোকের আতিশয্যে নবিজির ইনতিকালে বিষয়টি অস্বীকার করে বসেন। আবু বকর রা. তখন সেখানে গিয়ে[১৮৭] সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি প্রথমে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ

---

[১৮৩] হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. এ মতকে প্রধান্য দিয়েছেন। *ফাতহুল বারি*: ১৬।

[১৮৪] *সহিহ বুখারি*।

[১৮৫] ইমাম বায়হাকি রাহ. তাঁর গ্রন্থে আয়েশা রা.-এর এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, নবিজি ﷺ-এর শেষ সময়ে তাঁর মুখ থেকে اَلصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "নামাজ ও তোমাদের অধীনদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখো" এ কথা উচ্চারিত হচ্ছিল।

[১৮৬] *খাসায়িসুল কুবরা*।

[১৮৭] নবিজির ইনতিকালের সময় আবু বকর রা. তাঁর গ্রামের বাড়িতে ছিলেন।

انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾

'মুহাম্মাদ একজন রাসুলমাত্র। তাঁর আগেও বহু রাসুল গত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' [সুরা আলে ইমরান : ১৪৪]

তোমাদের যারা মুহাম্মাদের উপাসনা করতে তারা শোনো, মুহাম্মাদ ইনতিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর উপাসনা করতে তোমরা শোনো, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না।

সাহাবিরা তখন ধীরে ধীরে হুঁশে আসতে থাকেন। অনেকের মনে হচ্ছিল আয়াতটি এইমাত্র যেন নাজিল হচ্ছে।[১৮৮]

নবিজির ইনতিকালের পর প্রথম জরুরি কাজ ছিল, তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচন করা। কেননা, ধর্মীয় ও জাগতিক সব কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটা এবং ভেতর ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াও নবিজির কাফন-দাফনের ব্যাপারেও মতবিরোধের সমূহ আশঙ্কা ছিল। ফলে সাহাবিরা নবিজির কাফন-দাফনের আগেই খলিফা নির্বাচনকে জরুরি মনে করেন। এ জন্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে কিছু সময়ও লেগে যায়। তাই সোমবার তিনি ইনতিকাল করলেও বুধবার পর্যন্ত কাফন-দাফনের কাজ মুলতুবি করা হয়।

মুহাজিররা তখন জড়ো হচ্ছিলেন আবু বকরের আর আনসাররা সাকিফায়ে বনু সায়িদায় সাআদ ইবনু উবাদার পাশে। আবু বকর বিষয়টি জানতে পেরে উমর ও আবু আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহসহ নেতৃস্থানীয় কতিপয় মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সাকিফায়ে বনু সায়িদায়। সেখানে পৌঁছার পর আলোচনার একপর্যায়ে আবু বকরের হাতে সবাই খিলাফতের বায়আত হন।[১৮৯]

বুধবার রাতে আলি, আব্বাস রা. এবং আরও কয়েকজন নবিজিকে গোসল দিয়ে কাফন পরান। এরপর জানাজার নামাজ পড়া হয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবিজির কবর আয়েশার ঘরের সে স্থানটিতে খনন করা হয়, যেখানে তাঁর ইনতিকাল হয়েছে। আবু তালহা রা. নবিজির কবর খনন করেন এবং আলি ও আব্বাস প্রমুখ নবিজির লাশ মুবারক কবরে রাখেন। কবরটি এক বিঘত পরিমাণ উঁচু রাখা হয়।

---

[১৮৮] *আবু বকর সিদ্দিক রা.*, ড. আলি সাল্লাবি (অনুবাদকের কথা, আবদুর রশীদ তারাপাশী : ১১)

[১৮৯] *আবু বকর সিদ্দিক রা*, ড. আলি সাল্লাবি (কালান্তর প্রকাশনী, আবদুর রশীদ তারাপাশি অনূদিত)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবিজির স্বভাবচরিত্র ও মুজিজা

নবিজির জীবনচরিত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার পর তাঁর উন্নত স্বভাবচরিত্রের কিছু আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা জরুরি মনে করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।[১৯০]

এক. উত্তম স্বভাবচরিত্র

নবিজি ﷺ সবচেয়ে সাহসী, দূরদর্শী, বাহাদুর এবং অধিক দানশীল ছিলেন। যখনই কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইত, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা দিয়ে দিতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। সাহাবিরা একবার তাঁকে বলেন, তিনি যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। তখন নবিজি ﷺ বলেন, 'আমি রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, বদদুআ করতে নয়।'

তাঁর দাঁত মুবারক শহিদ করা হয়েছিল, তবু তিনি তাদের জন্য বদদুআ করেননি; বরং মাগফিরাতের দুআ করেছেন। তিনি সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন, এ জন্য তাঁর দৃষ্টি কারও ওপর স্থির থাকত না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রতিশোধপরায়ণ ছিলেন না এবং রাগও করতেন না; বরং ক্ষমাই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। কিন্তু আল্লাহর বিধানের ওপর কেউ হাত ওঠালে তিনি রাগান্বিত হতেন। তিনি যখন রাগ করতেন, তখন তাঁর সামনে কেউ দাঁড়ানোর সাহস পেত না। তাঁকে যখন দুটি কাজের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তখন তিনি উম্মতের প্রতি লক্ষ রেখে সহজটি বেছে নিতেন। তিনি কখনো খাবারের দোষ খুঁজে বের করেননি; পছন্দ হলে খেতেন, নাহয় খেতেন না। নবিজি ﷺ কখনো হেলান দিয়ে বসে বা চেয়ার-টেবিলে বসে খাবার খাননি।

নবিজির জন্য কখনো পাতলা রুটি তৈরি করা হয়নি। খেজুরের সঙ্গে কাকড়ি (শসাজাতীয়) ও খুরবুজা (তরমুজজাতীয় ফল) মিশিয়ে খেতেন। মধুসহ অন্য সব মিষ্টিজাতীয় খাবার স্বভাবগতভাবে পছন্দ করতেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এ অবস্থায়

---

[১৯০] এগুলো সবই সিরাতে মুগলতাইয়ের অনুবাদ। আমি আমার আদাবুন নাবি গ্রন্থে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

যে, তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ কখনো পেট ভরে যবের রুটিও খাননি। এমনকি নবিজির ঘরের লোকদের এভাবে দুমাসও কেটেছে যে, তাঁদের ঘরের চুলোয় আগুন পর্যন্ত জ্বলেনি। শুধু খুরমা আর পানি পান করে তাঁরা দিন পার করতেন।

নবিজি নিজের জুতো নিজেই সেলাই করতেন এবং নিজেই কাপড়ে তালি লাগাতেন। পরিবারের সব কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন। অসুস্থদের দেখতে যেতেন এবং খোঁজখবর নিতেন। কেউ যখন তাঁকে দাওয়াত করত—সে ধনী হোক বা গরিব, তিনি সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। গরিব-নিঃস্ব বলে অবজ্ঞা করতেন না; আবার কোনো রাজার বিশাল সাম্রাজ্যের কারণে ভয় করতেন না। তিনি তাঁর বাহনের পেছনে দাস বা এ জাতীয় লোকদের বসাতেন।

নবিজি মোটা কাপড় পরতেন। সেলাই করা জুতো পরতেন এবং সাদা কাপড় পছন্দ করতেন। অধিক জিকির করতেন। অনর্থক কথাবার্তা ও কাজ এড়িয়ে চলতেন। নামাজ দীর্ঘ আর খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন। দাস বা এ জাতীয় লোকদের সঙ্গে চলতে দ্বিধা-সংকোচ করতেন না।

নবিজি সুগন্ধি পছন্দ আর দুর্গন্ধ ঘৃণা করতেন। জ্ঞানীগুণীদের সম্মান করতেন। অহংকার বা কর্কশ ভাষায় কথা বলতেন না। নির্দোষ খেলাধুলা থেকে নিষেধ করতেন না। কখনো কখনো তিনি হাস্যরসাত্মক কথা বলতেন, তবে সেসব কথায় বাস্তবতাবহির্ভূত কিছু বলতেন না। মানুষের মধ্যে তিনি সর্বাধিক হাস্যমুখ এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কেউ কোনো বিষয়ে অপারগতা দেখালে সহজেই মেনে নিতেন।

আয়েশা রা. বলেন, 'নবিজির স্বভাবচরিত্র হচ্ছে পবিত্র কুরআন। অর্থাৎ, কুরআন যেসব বিষয় পছন্দ করত, তিনিও সেসব পছন্দ করতেন; আর যেসব কথা ও কাজ কুরআন অপছন্দ করত, তিনিও সেসব অপছন্দ করতেন।'[১৯১]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত; 'আমি রাসুল ﷺ থেকে যে সুগন্ধি পেয়েছি, তাঁর চেয়ে বেশি সুগন্ধি আমি অন্য কোথাও অনুভব করিনি।'[১৯২]

দুই. নবিজির মুজিজা

পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা যখন কাউকে কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, তখন তার সঙ্গে এমন কিছু নিদর্শন পাঠান, যাতে লোকেরা সহজে তার কর্তৃত্বের ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারে। যেমন : কিছু দাস-দাসী, সেনা ও এমন কিছু ক্ষমতা, যা সাধারণ মানুষ বাস্তবায়ন করতে পারে না। এমনিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ যখন রাসুল

---

[১৯১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৮১৩।

[১৯২] *শারহুস সুন্নাহ* : ৩৬৬৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩০৫৭।

হিসেবে পৃথিবীতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সততা, দীনদারি, আমানতদারিতা, উত্তম চরিত্রমাধুর্য, শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণাবলি ও নিদর্শনের পাশাপাশি অলৌকিক কিছু শক্তিও সঙ্গে দেওয়া হয়। এর ফলে বিরোধিতাকারীদের মাথা সহজে ঝুঁকে যায়। এই অলৌকিক শক্তি, যা প্রাকৃতিক ক্ষমতাবহির্ভূত, সেটাকে মুজিজা বা অলৌকিক ক্ষমতা বলা হয়।

আমাদের নবিজির মুজিজা ও বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী নবিদের মুজিজা থেকে বেশি ও উত্তম। পূর্ববর্তী নবিগদের মুজিজা তাঁদের জীবদ্দশা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু আমাদের নবির শ্রেষ্ঠ মুজিজা পবিত্র কুরআন মাজিদ আজও প্রত্যেক মুসলমানের হাতে রয়েছে, যার মোকাবিলা করতে পৃথিবীর তাবৎ শক্তি তথা মানুষ ও জিন অক্ষম।

এ ছাড়া চাঁদ দ্বিখণ্ড করা,[১১৩] আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া, পাথরকণার তাসবিহ পড়া, কাঠের খুঁটির কান্না করা, গাছ কর্তৃক নবিজিকে সালাম করা, কতগুলো গাছকে ডাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশে চলে আসা, মিরাজ তথা মাত্র এক রাতেই মক্কা থকে বায়তুল মাকদিস এবং সাত আসমান সফর করে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাতেই আবার ফিরে আসা। এ ছাড়া অসংখ্য ভবিষ্যদ্‌বাণী যথাসময়ে সূর্যের মতো পরিষ্কার সত্য হয়ে বাস্তবায়িত হওয়াসহ হাজার হাজার মুজিজা প্রকাশ পেয়েছে। এসব যে শুধু কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তা নয়; বরং অনেক কাফিরের সাক্ষ্যেও সেগুলো প্রমাণিত।

এসব মুজিজা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু আলিম তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এসব নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। এ বিষয়ের ওপর লিখিত *খাসায়িসুল কুবরা* ও *আল-কালামুল মুবিন* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি সেগুলো এখানে উল্লেখ করিনি।

---

[১১৩] সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে এবার ইয়াহুদি পণ্ডিতরা কুরাইশ নেতাদের বিস্ময়কর একটা কৌশল শিখিয়ে দিল। তারা বলল, মুহাম্মাদ জাদুকর কি না, তা যাচাইয়ের প্রকৃষ্ট একটা পন্থা হচ্ছে, জাদুর প্রভাব কেবল জমিনেই সীমাবদ্ধ থাকে; আসমানে এর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। অতএব তোমরা মুহাম্মাদকে বলো, সে চাঁদ দ্বিখণ্ড করে দেখাক। সম্ভবত মুসা আ. কর্তৃক লাঠির সাহায্যে নদী বিভক্ত হওয়ার মুজিজা থেকেই চন্দ্র দ্বিখণ্ড করার চিন্তাটি ইয়াহুদিদের মাথায় এসেছিল। অথচ নদী বিভক্ত করার চেয়ে চাঁদ দ্বিখণ্ড করা কত কঠিন বিষয়। কেননা, এটি দুনিয়ার এবং অন্যটি আকাশের। কুরাইশ নেতারা তাই খুশিতে গদগদ হয়ে গেল এই ভেবে যে, এবার নির্ঘাত মুহাম্মাদ পরাজিত হবেন। ফলে তারা দল বেঁধে রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করল। এ সময় সেখানে আলি, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, জুবায়ের ইবনু মুতইম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনেক সাহাবি এ বিষয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ কারণে হাফিজ ইবনু কাসির রাহ. এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। (ইবনু কাসির, সুরা কামারের তাফসির)।

কুরাইশ নেতারা এ প্রশ্ন করলে আল্লাহর হুকুমে রাসুল ﷺ-এর এই মুজিজা প্রদর্শিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে চাঁদ দ্বিখণ্ড হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে ছিটকে পড়ে। উভয় টুকরোর মধ্যখানে 'হেরা' পর্বত আড়াল হয়ে পুনরায় উভয় টুকরো এসে যুক্ত হয়ে যায়। এ সময় রাসুল ﷺ মিনায় ছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা কামার নাজিল হয়। (*সহিহ বুখারি* : ৩৮৬৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৮০০; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৮৫৪-৫৫।)

সপ্তম অধ্যায়

নবিজির ৪০ হাদিস

জাওয়ামিউল কালিম বা ৪০ হাদিস

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দীন সম্পর্কিত ৪০টি হাদিস আমার উম্মতের উপকারের জন্য শোনাবে এবং মুখস্থ করবে,[১১৪] কিয়ামত-দিবসে আল্লাহ তাকে আলিম ও শহিদদের সঙ্গে ওঠাবেন এবং বলবেন, যে দরজা দিয়ে খুশি সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।'[১১৫]

এই বিশাল সাওয়াবের আশায় উম্মাহর লাখো আলিম নিজ নিজ পন্থা ও পদ্ধতিতে চেহেল হাদিস বা ৪০ হাদিস সংকলন করেছেন, যেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য বেশ উপকারী ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।[১১৬] ফলে আমারও মনে হলো, এ গ্রন্থে সেই ৪০ হাদিস যুক্ত করে দিই। যারা এগুলো মুখস্থ করবে, তারা বিপুল সাওয়াব অর্জন করবে। পাশাপাশি তাদের এই পড়ার বরকতে আমি অধমও ৪০ হাদিস সংকলনকারী মহানদের অন্তর্ভুক্ত হব এবং অনেক সাওয়াব পাব।

উল্লেখ্য, এসব হাদিস *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমের* বর্ণনাসূত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী হাদিস। বর্তমানে যেহেতু সাধারণভাবে মানুষের নৈতিক স্খলন আশঙ্কাজনক, অন্যদিকে শৈশবেই শিশুদের মনমস্তিষ্কে চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষা দিলে তা তাদের জীবনে

---

[১১৪] হাদিসের সংরক্ষণ দু-ভাবে হতে পারে। ১. মুখস্থ করে, ২. লিখে। এ জন্য হাদিসে বর্ণিত সেই ওয়াদার মধ্যে সে-সকল লোকও অন্তর্ভুক্ত, যারা এই ৪০টি হাদিস গ্রন্থাকারে ছাপিয়ে প্রচার করে থাকেন। যারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, তারা প্রত্যেকটি কপির বিনিময়ে অসংখ্য সাওয়াব লাভ করবেন; আর যদি কেউ বঞ্চিত হয়, তবে এটা তার দুর্ভাগ্য।

[১১৫] হাদিসটি ইবনু আব্বাস রা. থেকে ইবনু আদি বর্ণনা করেছেন এবং আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে ইবনু নাজ্জার বর্ণনা করেছেন। *আল-জামিউস সাগিরে* হাদিসটি বর্ণিত আছে। *মুসনাদু আবু ইয়ালা* : ১/১৯৪; *কানজুল উম্মাল* : ১০/১৩৬।

[১১৬] আমার যোগ্যতা ও মনোবলের দিক দিয়ে এ মহান কাজে হাত দেওয়াটা অনেক বেশি অগ্রসর হওয়ার মতো; কিন্তু অধম কর্তৃক লিখিত মহানবি ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া* গ্রন্থটি যখন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হলো, তখন মনে হলো গ্রন্থের শেষে যদি ৪০ হাদিস যুক্ত করে দিই, তাহলে শিক্ষার্থীরা সহজেই তা মুখস্থ করতে পারবে।

অত্যন্ত কার্যকরী হয়, অন্তরের গভীরে রেখাপাত করে, ফলে অধিকাংশ হাদিসই এমন, যেগুলো উন্নত চরিত্র, সমাজ ও সভ্যতার মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত।

১ নং হাদিস

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

নিশ্চয় সব কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (অর্থাৎ, নিয়ত ভালো হলে কাজও ভালো হয়; আর নিয়ত মন্দ হলে কাজটিও মন্দ হয়।)[১৯৭]

২ নং হাদিস

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের পাঁচটি হক বা অধিকার রয়েছে, যথা : ১. সালামের জওয়াব দেওয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজখবর নেওয়া, ৩. জানাজায় শরিক হওয়া, ৪. দাওয়াত গ্রহণ করা এবং ৫. হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।[১৯৮]

৩ নং হাদিস

لا يَرْحَمُ اللهُ مَن لا يَرْحَمُ النَّاسَ

আল্লাহ তাআলা সে মানুষের ওপর রহম করেন না, যে মানুষের ওপর রহম করে না।[১৯৯]

৪ নং হাদিস

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২০০]

৫ নং হাদিস

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২০১]

---

১৯৭ *সহিহ বুখারি ও মুসলিম।*
১৯৮ প্রাগুক্ত।
১৯৯ প্রাগুক্ত।
২০০ প্রাগুক্ত।
২০১ প্রাগুক্ত।

৬ নং হাদিস

الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অবশ্যই জুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে।[২০২]

৭ নং হাদিস

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزارِ فَفِي النَّار

লুঙ্গি, পাজামা বা প্যান্টের যে অংশটুকু পায়ের গিঁটের নিচে যাবে, তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[২০৩] (শরীরের একটি অংশ জাহান্নামে গেলে পুরো শরীরই জাহান্নামে যাবে। অর্থাৎ, এ অংশটুকু ঢেকে রাখার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে।)

৮ নং হাদিস

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

ওই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।[২০৪]

৯ নং হাদিস

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّه

যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত।[২০৫]

১০ নং হাদিস

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

সে লোক প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং প্রকৃত বীর সে, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।[২০৬]

১১ নং হাদিস

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

---

২০২ প্রাগুক্ত।

২০৩ প্রাগুক্ত। : (লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট অথবা যে কোন কাপড় টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে পরা কবিরা গুনাহ। চাই তা গর্ব করেই হোক অথবা এমনিতেই।)

২০৪ *সহিহ বুখারি।*

২০৫ *সহিহ মুসলিম।*

২০৬ *সহিহ বুখারি ও মুসলিম।*

যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারবে।[২০৭] (অর্থাৎ, লজ্জার কারণে তুমি যেসব মন্দকাজ পরিত্যাগ করতে, লজ্জা চলে যাওয়ার ফলে সেগুলো তুমি নির্দ্বিধায় করতে পারবে।)

১২ নং হাদিস

أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়; যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।[২০৮]

১৩ নং হাদিস

لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ ولا تَصاوِيرُ

যে ঘরে কুকুর অথবা প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।[২০৯]

১৪ নং হাদিস

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا

তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয়, যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।[২১০]

১৫ নং হাদিস

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ।[২১১]

১৬ নং হাদিস

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

একজন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে কোনো মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে।[২১২]

---

[২০৭] প্রাগুক্ত।
[২০৮] প্রাগুক্ত।
[২০৯] প্রাগুক্ত।
[২১০] প্রাগুক্ত।
[২১১] *সহিহ মুসলিম।*
[২১২] *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম।*

১৭ নং হাদিস

لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

প্রকৃত মুমিন একই গর্তে দু-বার দংশিত হয় না।[২১৩]

১৮ নং হাদিস

الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

অন্তরের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।[২১৪]

১৯ নং হাদিস

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

পৃথিবীতে তুমি এমনভাবে থাকো, যেন তুমি একজন মুসাফির ছাড়া কিছু নও।[২১৫]

২০ নং হাদিস

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, (যাচাই না করে) তা অন্যের কাছে বলে বেড়ায়।[২১৬]

২১ নং হাদিস

عَمّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ

চাচা পিতার মতো (শ্রদ্ধার পাত্র)।[২১৭]

২২ নং হাদিস

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, কিয়ামত-দিবসে আল্লাহ তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।[২১৮]

---

[২১৩] *সহিহ বুখারি।*

[২১৪] *সহিহ বুখারি ও মুসলিম*

[২১৫] প্রাগুক্ত।

[২১৬] *সহিহ মুসলিম।*

[২১৭] *সহিহ বুখারি ও মুসলিম।*

[২১৮] প্রাগুক্ত।

২৩ নং হাদিস

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ

সে ব্যক্তিই সফল, যে ইসলামগ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজনীয় রিজিক দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন।[২১৯]

২৪ নং হাদিস

أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

কিয়ামতের দিন সব থেকে শক্ত শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি তৈরি করে।[২২০]

২৫ নং হাদিস

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।[২২১]

২৬ নং হাদিস

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

কোনো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[২২২]

২৭ নং হাদিস

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২২৩]

২৮ নং হাদিস

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

আমিই শেষ নবি, আমার পরে আর কোনো নবি আসবেন না।[২২৪]

---

২১৯ *সহিহ মুসলিম।*

২২০ *সহিহ বুখারি ও মুসলিম।*

২২১ *সহিহ মুসলিম।*

২২২ *সহিহ বুখারি ও মুসলিম।*

২২৩ *সহিহ মুসলিম।*

২২৪ *সহিহ বুখারি ও মুসলিম।*

২৯ নং হাদিস

لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً

তোমরা একে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করো না, একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরে হিংসা করো না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।[২২৫]

৩০ নং হাদিস

أَنَّ الإِسلامَ يهدِمُ ما كان قَبلَه وأَنَّ الهِجرةَ تهدِمُ ما كان قبلَها وأَنَّ الحجَّ يهدِمُ ما كان قبلَه

ইসলামগ্রহণের আগে যেসব গুনাহ করা হয়, ইসলাম সেসব বিনাশ করে দেয়। হিজরতের আগে যেসব গুনাহ করা হয়, হিজরত সেসব মাফ করে দেয়। এমনিভাবে হজও তার আগের সব গুনাহ মিটিয়ে দেয়![২২৬]

৩১ নং হাদিস

إنَّما الأعمالُ بالخَواتِيمِ

কাজের শেষ অংশের ওপরই সব কাজের ভালোমন্দ নির্ভর করে।[২২৭]

৩২ নং হাদিস

الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وقَتْل النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ

কবিরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।[২২৮]

৩৩ নং হাদিস

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

[২২৫] সহিহ বুখারি।

[২২৬] সহিহ মুসলিম।

[২২৭] প্রাগুক্ত।

[২২৮] প্রাগুক্ত।

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

যে কোনো মুমিনের পার্থিব কোনো বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ভয়াবহ বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন। যে কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য সহজ ব্যবস্থা (দুর্দশা লাঘব) করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন। যে কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন।[২২৯]

৩৪ নং হাদিস

أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হচ্ছে সে, যে অতিমাত্রায় ঝগড়াটে। অর্থাৎ, সর্বদা ঝগড়া করে।[২৩০]

৩৫ নং হাদিস

كلّ بدعة ضلالةٌ

প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।[২৩১]

৩৬ নং হাদিস

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ

পাবিত্রতা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।[২৩২]

৩৭ নং হাদিস

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয় প্রিয় জায়গা হচ্ছে মসজিদসমূহ।[২৩৩]

---

[২২৯] প্রাগুক্ত।
[২৩০] সহিহ বুখারি ও মুসলিম।
[২৩১] সহিহ মুসলিম।
[২৩২] প্রাগুক্ত।
[২৩৩] প্রাগুক্ত।

৩৮ নং হাদিস

لَا تَتَخِذُوْا الْقبوْرَ مَسَاجِدَ

তোমরা কবরসমূহকে সিজদার জায়গা বানিয়ো না।[২৩৪]

৩৯ নং হাদিস

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

তোমরা নামাজের কাতারসমূহ অবশ্যই সোজা রাখবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেবেন।[২৩৫]

৪০ নং হাদিস

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

যে আমার ওপর একবার দুরুদ পড়ে, আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত নাজিল করেন।[২৩৬]

সমাপ্ত

✧◆✧

২৩৪ প্রাগুক্ত।
২৩৫ প্রাগুক্ত।
২৩৬ সহিহ বুখারি।

অনুশীলনী

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর বংশপরিচয় বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : পিতা-মাতার দিক থেকে নবিজির বংশধারা বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : ইরহাসাত কাকে বলে?

প্রশ্ন : গর্ভকালে নবিজির মা আমিনা কী কী বরকত পেয়েছিলেন? বিশদ বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন : হস্তিবাহিনীর ঘটনা কত খ্রিষ্টাব্দে ঘটে?

প্রশ্ন : পৃথিবীতে নবিজির আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : আদম আ. ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যখানে কত হাজার বছরের ব্যবধান ছিল?

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর জন্মের সময় ঘটে যাওয়া বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : নবিজির সম্মানিত পিতা কবে, কোথায় ইনতিকাল করেন? বিস্তারিত লিখো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-কে প্রথমে কে দুধ পান করান?

প্রশ্ন : হজরত হালিমা সাদিয়া রা. কীভাবে নবিজিকে দুধপান করানোর দায়িত্ব পান?

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-কে নেওয়ার পর হালিমা রা. কী কী বরকত লাভ করেন? লিখো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর পবিত্র মুখের প্রথম কথা কী ছিল?

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর দৈহিক গঠন কেমন ছিল? বিস্তারিত লিখো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ শৈশবে কার সঙ্গে এবং কেন বকরি চরাতেন? লিখো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর দুধভাইয়ের নাম কী ছিল?

প্রশ্ন : প্রথমবার কখন রাসুল ﷺ-এর বক্ষবিদারণ করা হয়? বিস্তারিত লিখো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর বক্ষবিদারণের পর হালিমা রা. তাঁকে কার কাছে নিয়ে যান? এবং সে তখন কী বলল?

প্রশ্ন : হালিমা সাদিয়া কেন নবিজিকে তাঁর মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন?

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর সম্মানিত মা কখন কোথায় ইনতিকাল করেন?

প্রশ্ন : মায়ের ইনতিকালের পর নবিজি ﷺ কার কাছে লালিতপালিত হন?

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর দাদার নাম কী? তিনি কখন ইনতিকাল করেন?

প্রশ্ন : আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকালের সময় নবিজির বয়স কত ছিল?

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ কত বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে শামের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং কেন করেন?

প্রশ্ন : বুহায়রা রাহিব কে ছিলেন? তিনি নবিজি ﷺ সম্পর্কে কী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন? বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ দ্বিতীয়বার কেন শাম ভ্রমণ করেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : দ্বিতীয়বার শাম সফরে নবিজির সঙ্গে যে ইয়াহুদি পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার নাম কী এবং তিনি কী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন?

প্রশ্ন : খাদিজা রা. নবিজিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন কেন? তখন তাঁদের বয়স কত ছিল? বিস্তারিত লিখো।

প্রশ্ন : নবিজির বিয়ের খুতবা কে পাঠ করেছিলেন এবং খুতবায় কী বলেছিলেন? লিখো।

প্রশ্ন : খাদিজা রা. নবিজির সান্নিধ্যে কত বছর অতিবাহিত করেন?

প্রশ্ন : খাদিজার গর্ভে নবিজির কতজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন? তাঁদের নাম লিখো।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর কন্যাদের বিস্তারিত পরিচয় দাও।

প্রশ্ন : নবিজির উপনাম কী ছিল এবং কেন এ নামে ডাকা হতো?

প্রশ্ন : স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রাসুল ﷺ রুকাইয়া রা.-কে কী বলেছিলেন?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর কতজন স্ত্রী ছিলেন? তাঁদের নাম লিখো।

প্রশ্ন : নবিপত্নীদের মধ্যে কতজন তাঁর জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন? তাঁদের নাম কী?

প্রশ্ন : কোন বছরকে 'আমুল হুজন' বা 'শোকের বছর' বলা হয় এবং কেন বলা হয়?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জানো লিখো।

প্রশ্ন : সাওদা বিনতু জামআ রা.-এর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : হাফসা রা. কে ছিলেন? নবিজির সঙ্গে তাঁর বিয়ে কখন হয়েছিল?

প্রশ্ন : উম্মু হাবিবা বিনতু আবু সুফিয়ান রা. সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : জায়নাব বিনতু খুজায়মা হিলালিয়া রা. সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

প্রশ্ন : উম্মু সালামা রা. সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : নবিজির কোন স্ত্রী এক নবির বংশধর এবং আরেক নবির স্ত্রী ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জানো লিখো।

প্রশ্ন : জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিস খুজাইয়া রা. সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : মায়মুনা বিনতু হারিস হিলালিয়া রা. সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ আজওয়াজে মুতাহহারাত বা পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ ছাড়া অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন কি?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর বহুবিয়ে বা চারজনের অধিক বিয়ের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে সীমারেখা কখন নির্ধারণ করা হয় এবং কেন করা হয়?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর চাচা ও ফুফু কতজন ছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে যা জানো লিখো।

প্রশ্ন : হজরত আয়েশা রা. থেকে কতটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে?

প্রশ্ন : কোন যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর কতজন পাহারাদার ছিলেন? এবং কখন থেকে এ ব্যবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়?

প্রশ্ন : কাবাঘর পুনর্নির্মাণের সময় রাসুল ﷺ-এর বয়স কত ছিল?

প্রশ্ন : কাবা নির্মাণের কোন পর্যায়ে গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়?

প্রশ্ন : কাবা নির্মাণকালে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব কীভাবে নিরসন করা হয়?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ কখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন? তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

প্রশ্ন : নবিজিকে কখন 'আল আমিন' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ প্রথমে কীভাবে ইসলামের দাওয়াত দেন?

প্রশ্ন : নবিজির দাওয়াতে প্রথমে কারা ইসলামগ্রহণ করেছিলেন? তাঁদের নাম লিখো।

প্রশ্ন : আবু বকর রা.-এর প্রচেষ্টায় কারা ইসলামগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ কখন থেকে প্রকাশ্যে ইসলামপ্রচারে আদিষ্ট হন?

প্রশ্ন : ইসলামপ্রচারের কারণে ক্ষিপ্ত কুরাইশরা নবিজির চাচা আবু তালিবের কাছে কী আবেদন করেছিল?

প্রশ্ন : কুরআন নাজিলের সূচনা কোথা থেকে শুরু হয়?

প্রশ্ন : ইসলামপ্রচার থেকে বিরত থাকতে কাফিররা নবিজি ﷺ-কে কী কী প্রস্তাব দিয়েছিল? তখন নবিজি কী উত্তর দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন : হজমৌসুমে কাফিররা নবিজির বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত করেছিল এবং এর পরিণতি কী হয়েছিল?

প্রশ্ন : আবু জাহল নবিজিকে হত্যা করতে গিয়ে পালিয়ে এল কেন?

প্রশ্ন : উতবা ইবনু রাবিআ নবিজিকে কী বলেছিল এবং নবিজি কী উত্তর দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন : মুসলিমরা প্রথমে কোথায় হিজরত করেন এবং কেন হিজরত করেন? প্রথম হিজরতকারীদের সংখ্যা কত?

প্রশ্ন : বাদশাহ নাজাশির দরবারে জাফর ইবনু আবি তালিব রা.-এর ভাষণ ও এর ফলাফল বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : উমর রা. কখন ইসলামগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন : মুসলিমদের সঙ্গে কুরাইশদের বয়কটের বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : দ্বিতীয়বার হাবশায় কতজন সাহাবি হিজরত করেন?

প্রশ্ন : কীভাবে কুরাইশদের বয়কটের পরিসমাপ্তি ঘটে?

প্রশ্ন : তুফায়িল ইবনু আমর দাওসি রা. কখন ইসলামগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন : কোন বছর নবিজি ﷺ জায়েদ রা.-কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ যান এবং তায়েফে যাওয়ার কারণ কী?

প্রশ্ন : তায়েফবাসী নবিজির সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিল?

প্রশ্ন : ইসরা ও মিরাজ কোন বছর সংঘটিত হয়? বিস্তারিত বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ মিরাজ ভ্রমণে কোন আসমানে কোন নবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন?

প্রশ্ন : আবু বকর রা.-কে 'সিদ্দিক' বলা হয় কেন?

প্রশ্ন : নবিজির ইসরা সম্পর্কে কুরাইশের বিভিন্ন বাণিজ্যকাফেলা কী সাক্ষী দিয়েছিল? লিখো।

প্রশ্ন : মদিনায় ইসলামের সূচনা কীভাবে হয়?

প্রশ্ন : আকাবার প্রথম বায়আতে কতজন লোক অংশ নেন?

প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম মাদরাসা কোথায়, কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

প্রশ্ন : উম্মু আম্মারার পুত্র হুবাইব রা. কীভাবে শাহাদাতবরণ করেন?

প্রশ্ন : আকাবার দ্বিতীয় বায়আত কতজন অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে কতজনকে আমির নির্ধারণ করা হয়?

প্রশ্ন : ইসলামপ্রচারের চতুর্থ বছর কতজন নারী-পুরুষ মক্কায় আসেন? আব্বাস রা. তাঁদের কী বলেছিলেন? বিস্তারিত বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : মদিনায় হিজরতের সূচনা কীভাবে হয়?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর হিজরতের সংবাদ পেয়ে কাফিররা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?

প্রশ্ন : হিজরতকালে নবিজি ﷺ কোন গুহায় কত দিন আত্মগোপন করেছিলেন?

প্রশ্ন : সাওর গুহা থেকে মদিনায় কীভাবে যাত্রা শুরু করেন?

প্রশ্ন : মদিনায় যাত্রাপথে রাসুল ﷺ-কে ধরতে কে এবং কেন পিছু ধাওয়া করছিল?

প্রশ্ন : সুরাকা যখন নবিজির একেবারে কাছে চলে আসে, তখন তার ঘোড়ার পরিণতি কী হয়েছিল?

প্রশ্ন : সুরাকার সঙ্গে নবিজি ﷺ কী আচরণ করেছিলেন? লিখো।

প্রশ্ন : সুরাকার মুখে নবিজির নবুওয়াতের স্বীকারোক্তির বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : উম্মু মাবাদের ঘরে নবিজি ﷺ কখন মেহমান হন? সেখানে নবিজির মাধ্যমে কোন মুজিজা প্রকাশ পেয়েছিল?

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ কুবায় কত দিন অবস্থান করেন?

প্রশ্ন : কখন হিজরিবর্ষের সূচনা হয়? এর প্রবর্তক কে?

প্রশ্ন : মদিনায় পৌঁছে নবিজি ﷺ কোথায় অবস্থান করেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : মসজিদে নববি কোথায়, কীভাবে নির্মিত হয়? লিখো।

প্রশ্ন : প্রথম অবস্থায় মসজিদে নববির নির্মাণশৈলী কেমন ছিল? লিখো।

প্রশ্ন : মক্কা থেকে হিজরত করে নবিজি ﷺ যখন মদিনায় উপনীত হন, তখন কোন দিকে ফিরে নামাজ পড়া হতো?

প্রশ্ন : ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে? নাকি উদারতায়? যুক্তি-প্রমাণের আলোকে বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : জিহাদের হাকিকত বা বাস্তবতা কী?

প্রশ্ন : আত্মরক্ষা ও আত্মক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লিখো।

প্রশ্ন : তথাকথিত সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয়দের যুদ্ধের চিত্রগুলো কী? উল্লেখ করো।

প্রশ্ন : 'রাজনীতিহীন ধর্ম এবং তরবারিহীন রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নয়'—বাক্যটার মর্মার্থ লিখো।

প্রশ্ন : গাজওয়া ও সারিয়ার সংখ্যা মোট কতটি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : প্রথম সারিয়া কার মাধ্যমে পরিচালিত হয়?

প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম তির কে নিক্ষেপ করেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : কিবলা কোন বছর পরিবর্তন হয়? বুঝিয়ে লিখো।

প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম গনিমত কে এবং কীভাবে অর্জন করেন?

প্রশ্ন : বদরযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : আবু জাহল কীভাবে নিহত হয়? বিস্তারিত লিখো।

প্রশ্ন : বদরের যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ কেমন ছিল? লিখো।

প্রশ্ন : আবুল আস রা.-এর ইসলামগ্রহণের ঘটনা লিখো।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় হিজরির উল্লেখযোগ্য তিনটি ঘটনা সংক্ষেপে লিখো।

প্রশ্ন : গাতফানযুদ্ধ কত হিজরিতে হয়?

প্রশ্ন : দাসুর কত হিজরিতে রাসুল ﷺ-কে হত্যা করতে অগ্রসর হয়েছিল? তার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? বিস্তারিত লিখো।

প্রশ্ন : উহুদযুদ্ধ কত হিজরিতে হয়? যুদ্ধের ঘটনা ফলাফল বিচার করে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর জন্য উহুদের ময়দানে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : উহুদযুদ্ধে কোন হতভাগা নবিজির চেহারা মুবারকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিল?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ ফজরের নামাজে কাদের বিরুদ্ধে এবং কেন বদদুআ করেন?

প্রশ্ন : আহজাবযুদ্ধের অপর নাম কী? বিস্তারিত লিখো।

প্রশ্ন : আহজাবযুদ্ধের কারণ বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : খন্দকযুদ্ধে নুআইম ইবনু মাসউদ রা.-এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : খন্দক বা পরিখা খননের পরামর্শ কে দিয়েছিলেন?

প্রশ্ন : খন্দকযুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর কত ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছিল?

প্রশ্ন : হজ কত হিজরিতে ফরজ হয়?

প্রশ্ন : হুদায়বিয়া কী ও কোথায় অবস্থিত?

প্রশ্ন : বায়আতে রিদওয়ানের পরিচয় দাও, এটা কোথায় এবং কেন সংঘটিত হয়?

প্রশ্ন : হুদায়বিয়া সন্ধির শর্তগুলো উল্লেখ করো।

প্রশ্ন : ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে যা জানো লিখো।

প্রশ্ন : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. কখন ইসলামগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন : খায়বারযুদ্ধের বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : মুতার যুদ্ধ কখন হয়? এ সম্পর্কে যা জানো লিখো।

প্রশ্ন : মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : আবু সুফিয়ান রা.-এর ইসলামগ্রহণের ঘটনা লিখো।

প্রশ্ন : হুনাইনযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : গাজওয়ায়ে তায়েফ কখন সংঘটিত হয়? সুন্দর করে লিখো।

প্রশ্ন : কত হিজরিতে কাজা উমরা আদায় করা হয়?

প্রশ্ন : তাবুকযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

প্রশ্ন : ইসলামে চাঁদার প্রচলন কখন থেকে শুরু হয়?

প্রশ্ন : মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব কাফির কেন? বর্ণনা করো।

প্রশ্ন : মসজিদে জিরার কী? সেটি কেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়?

প্রশ্ন : বনু সাকিফ ও বনু সাআদ ইবনু বকরের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : বিদায়হজ কত হিজরিতে অনুষ্ঠিত হয়? লিখো।

প্রশ্ন : আরাফার খুতবা বা বিদায়হজের ভাষণ সুন্দর করে লিখো।

প্রশ্ন : সারিয়ায়ে উসামা কে এবং কখন প্রস্তুত করেন?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর অন্তিম রোগ কখন শুরু হয় এবং তা কত দিন স্থায়ী ছিল?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর শেষ ভাষণ কী ছিল? লিখো।

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর শেষ কথা কী ছিল?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর কবর খনন করেন কে? এবং তাঁর লাশ মুবারক কে বহন করেন?

প্রশ্ন : রাসুল ﷺ-এর চরিত্রমাধুর্য সম্পর্কে যা জানো লিখো ।

প্রশ্ন : নবিজি ﷺ-এর পাঁচটি মুজিজা লিখো।

প্রশ্ন : ৪০ হাদিসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রশ্ন : অর্থসহ পাঁচটি হাদিস মুখস্থ লিখো।

সমাপ্ত

মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ.—সমগ্র বিশ্বের ইলমি ময়দানে যাঁর পরিচয় তিনি। এবং বিশেষত উপমহাদেশ যাঁর ইলম ও চিন্তার কারনামায় চিরঋণী; এই মনীষার রচিত গ্রন্থটির বাংলায়ন *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া* ﷺ। সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল এই গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে নবিজীবনের ছোট-বড় সমূহ দিক। বিশেষ বিবেচনায় নবিজির জিহাদ ও বহুবিয়ে নিয়ে করা হয়েছে স্মরণযোগ্য আলোচনা। দেওয়া হয়েছে এ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের বিভ্রান্তি, আপত্তি, সংশয় আর প্রশ্নের দালিলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব।

এমন আরও কিছু বিষয়ের সংযোজনে গ্রন্থটি অনন্যতায় পেয়েছে আকর্ষণীয় এক সুর ও সার। তা ছাড়া লেখক এর উৎস বানিয়েছেন হাদিস ও ইতিহাসের কালজয়ী সব গ্রন্থকে। ফলে এটি অঘোষিতভাবেই হয়ে উঠেছে সময়ের এক শ্রেষ্ঠ রচনা। আর তাই থানবি রাহ. তাঁর খানকায়ে ইমদাদিয়ার পাঠ্যসূচিভুক্ত করেন একে। এরপর থেকে আজ অবধি উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোর সিলেবাসে সুবাস ছড়াচ্ছে গ্রন্থটি।

সিলেবাসভুক্ত হলেও এর নির্দিষ্ট কোনো পাঠকশ্রেণি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা একে সর্বশ্রেণির জন্য সুপাঠ্য করতে যথাসাধ্য সতর্ক থেকেছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ফলে কিশোর ও সর্বসাধারণের কথা মাথায় রেখে এর ভাষায় পাণ্ডিত্যসুলভ উচ্চারণ পরিহার করেছি। বিপরীতে সহজ-সাধারণ শব্দ-বাক্য ব্যবহারে থেকেছি আন্তরিক।

Kalantor Prokashoni

ISBN : 978-984-96590-5-1
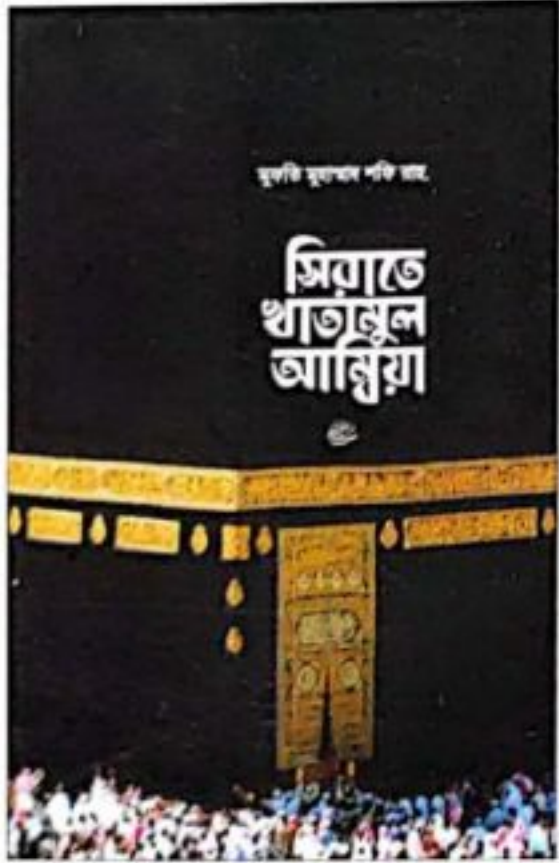
Sirate Khatamul Ambia S.M.
by Mufti Muhammad Shafi Rah.
Kalantor Prokashoni
মূল্য : ৳ ৬০ (নির্ধারিত)
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ